ইউনিট
২২

জনসংখ্যা ও পরিবেশ

ভূমিকা

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, কিন্তু এরা খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে একেবারে অসহায়। মানুষ নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না, এজন্য তাকে অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়। আমরা শুধুমাত্র খাদ্যের জন্যই উদ্ভিদের উপর নির্ভশীল নই, আমাদের বস্ত্র, বাসস্থান, ওষুধ-পথ্য, আসবাবপত্র, জ্বালানী, বিশুদ্ধ পানি এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্যও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদকে ব্যবহার করি। শুধু এখানে শেষ নয় সবুজ গাছপালা পরিবেষ্টিত নিসর্গ শ্যামলী আমাদের মনের খোরাক জোগায়। এমনভাবে মানুষসহ অন্যান্য উদ্ভিদ, প্রাণি ও সংশ্লিষ্ট জড় বস্তুর পারস্পরিক আদান-প্রদান ও ক্রিয়া বিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় জীবের বাস উপযোগী পরিবেশ। কিন্তু মানুষের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে পরিবেশ আজ হুমকির সম্মুখীন। তথাপি জনসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পরিবেশের বিপর্যয়কে আরও তরান্বিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে একলাখ সাতচল্লিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকায় প্রায় ১৫ কোটি লোকের বাস। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে গড়ে প্রায় ৮০০ জন লোক বাস করে। বর্তমান বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় ১.৭ ভাগ। এহারে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে ২০২০ সালে জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এ বিপুল পরিমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে গৃহিত পদক্ষেপে পরিবেশের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এজন্য বিভিন্ন ধরনের চক্র যেমন-পানি চক্র, কার্বন চক্র, নাইট্রোজেন চক্র ইত্যাদির উপর দেখা দিচ্ছে বিরুপ প্রতিক্রিয়া। গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার প্রভাব দিন দিন বেড়ে চলেছে। দেখা দিচ্ছে নিত্য নতুন ব্যাধি এইডস, ক্যান্সার ইত্যাদি। পরিবেশের এ বিপর্যয় রোধকল্পে আমাদের সচেতন হওয়া জরুরি। এ পৃথিবীকে স্বাভাবিক বাস উপযোগী তৈরিকল্পে, পরিবেশ বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

পাঠ ২২.১

বায়ু, পানি ও গাছপালার উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বায়ু, পানি গাছপালার সাথে জনগণের সম্পর্ক উল্লেখ করতে পারবেন;
- এগুলোর উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষতিকর প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন;
- ক্ষতিকর প্রভাব রোধকল্পে করণীয় পদক্ষেপগুলি আলোচনা করতে পারবেন।

বায়ু, পানি ও গাছপালার সাথে জনগণের সম্পর্ক

মানুষ বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাবলম্বী হলেও, সে কিন্তু খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে একেবারেই অসহায়। মানুষ তার নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না, এজন্য সে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল।

উদ্ভিদ প্রকৃতির এক অমূল্য সম্পদ। মানুষ তথা অন্যান্য জীব-জন্তুর দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় উদ্ভিদের গুরুত্ব অপরিসীম। অনাদিকাল থেকে মানুষ বেঁচে থাকার জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে আসছে। মানুষ তার শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। ঠিক এর বিপরীত প্রক্রিয়া ঘটে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে। তাছাড়া বৃষ্টির সঙ্গে বনাঞ্চলের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

বায়ু, পানি ও গাছপালার উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব : বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে পৃথিবীতে জনসংখ্যা প্রায় ৬ শত কোটি। বাংলাদেশের দিকে লক্ষ করলেই ব্যাপারটি সহজে অনুমান করা সম্ভব। ১৯৫০ সালে বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচ কোটি, যা ১৯৭০ সালে বেড়ে হয় সাড়ে সাত কোটি। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় পনের কোটি। আর এ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রধান তিনটি নিয়ামক হলো বায়ু, পানি ও গাছপালা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এ তিনটির উপর প্রভাব পড়ছে অধিক হারে।

মানুষসহ অন্যান্য প্রাণি তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বায়ুমন্ডল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। অন্যদিকে সকল সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ ও অক্সিজেন ত্যাগ করে। এমনিভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণির পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তাদের খাদ্য চাহিদা মেটাতে কৃষি জমির পরিমাণ বাড়াতে হচ্ছে। তাছাড়া এসমস্ত লোকের বাসস্থান, আসবাবপত্র তৈরি ও জ্বালানী চাহিদা মেটাতে ব্যাপকহারে বনাঞ্চল ধ্বংস করতে হচ্ছে। এক হিসেবে দেখা গেছে গত ৪০ বছরে পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলের প্রায় ৪০ শতাংশ বনাঞ্চল ধ্বংস করা হয়েছে। পৃথিবীব্যাপী বন ধ্বংসের পরিমাণ প্রতি মিনিটে ১৯০ একর। ১৯৮৮ সালের খরার আগুনে যুক্তরাষ্ট্রে ৬ মিলিয়ন একর বনাঞ্চল ধ্বংস হয়। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ ছিল ২৪ শতাংশ, বর্তমানে এখানে বনভূমির পরিমাণ আট শতাংশে নেমে এসেছে। প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় বনভূমির যেমন ভূমিকা আছে তেমনিভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানীদের মতে, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও সুষম জলবায়ুর জন্য একটি দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন।

বিজ্ঞানের ক্রম অগ্রগতির এ যুগে মানুষ চায় সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে বসবাস। আর মানুষের এ চাহিদা পূরণ করতে বাড়ছে আধুনিক মডেলের বিভিন্ন যানবাহন, এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ। এমনিভাবে শহরের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে এবং মানুষ গ্রামাঞ্চল ছেড়ে শহরমুখী হচ্ছে। ফলে ব্যাপকহারে যানবাহনের বৃদ্ধিতে বাড়ছে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন, যা প্রকৃতির বায়ুমন্ডলে তাপমাত্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করে

গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। গৃহস্থালীর জিনিসপত্রের মধ্যে রেফ্রিজারেটর, এয়ার কুলার, এ্যারোসল ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় বায়ুদূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অধিকসংখ্যক মানুষের বাসস্থান নির্মাণ ও চলাচলের জন্য বিভিন্ন জলাশায় ভরাট করা হচ্ছে, নদীতে কৃত্রিমভাবে বাধ নির্মাণ করা হচ্ছে। ফলে নদীগুলো দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে অধিক জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে ফসল বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার বাড়ছে, যা মাটি ও পানি দূষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলার পানি আর্সেনিক দূষণে দূষিত হয়েছে। সমগ্র বিশ্বে মোট পানির পরিমাণ ১৪১ বিলিয়ন ঘনমিটার। কিন্তু এ পানির মাত্র শতকরা ২ ভাগ স্বাদু পানি। আবার এ ২ ভাগের শতকরা ৮৭ শতাংশ বরফ, হিমবাহ, ভূগর্ভ, মাটি এবং আবহাওয়া মন্ডলের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে।

মানুষের ব্যবহার উপযোগী মোট পানির পরিমাণ ২০০০ ঘনকিলোমিটার। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে স্বাদু পানির পরিমাণ বৃদ্ধি না পাওয়ায় সমগ্র পৃথিবীব্যাপী পানির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কাজেই এ পৃথিবীতে সুষ্ঠুভাবে বসবাসের জন্য এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য একটি সুন্দর বাস উপযোগী পৃথিবী উপহার দিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আশু প্রয়োজন।

সারসংক্ষেপ

- উদ্ভিদ প্রকৃতির এক অমূল্য সম্পদ। মানুষ তথা অন্যান্য জীব জন্তুর দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় উদ্ভিদের গুরুত্ব অপরিসীম।
- বর্তমানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা প্রায় ৬ শত কোটি। বাংলাদেশের দিকে লক্ষ্য করলে বিষয়টি সহজেই অনুমেয়। ১৯৫০ সালে এদেশের জনসংখ্যা ছিল ৫ কোটি, বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও সুষম জলবায়ুর জন্য একটি দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যার পরিমাণ কত?
ক. ৪০০ কোটি খ. ৫০০ কোটি গ. ৬০০ কোটি ঘ. ৭০০ কোটি

২. বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যার পরিমাণ কত?
ক. প্রায় ১৪ কোটি খ. প্রায় ১৫ কোটি গ. প্রায় ১১ কোটি ঘ. প্রায় ১৬ কোটি

৩. উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের সময় বায়ু থেকে কোনটি গ্রহণ করে?
ক. অক্সিজেন খ. কার্বন ডাই অক্সাইড গ. নাইট্রোজেন ঘ. সালফার

৪. পৃথিবীতে মজুদ পানির মধ্যে স্বাদু পানির পরিমাণ কত?
ক. ২০ শতাংশ খ. ০.০৩ শতাংশ গ. ৮৭ শতাংশ ঘ. ২ শতাংশ

৫. বর্তমানে বাংলাদেশে বনাঞ্চলের পরিমাণ কত?
ক. প্রায় সাত শতাংশ খ. প্রায় আট শতাংশ গ. প্রায় চব্বিশ শতাংশ ঘ. প্রায় ষোল শতাংশ।

পাঠ ২২.২

প্রাকৃতিক চক্র; কার্বন চক্র ও এর উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রাকৃতিক চক্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- কার্বণ চক্র বর্ণনা করতে পারবেন;
- কার্বন চক্রের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব আলোচনা করতে পারবেন।

প্রাকৃতিক চক্র

সৃষ্টি জগতের শুরু থেকে জীব ও জড়ের মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে একটি সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। জড় পরিবেশ তথা মাটি থেকে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান আসে। আবার বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে স্থানান্তরের পর উদ্ভিদ ও প্রাণির মৃত্যুর মাধ্যমে আবার মাটিতে মিশে যায়। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন পানি, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ইত্যাদি পদার্থ। জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা এগুলি ব্যবহার করে থাকি। সৃষ্টির আদিকাল থেকে অব্যাহতভাবে ব্যবহারের ফলে এগুলি একসময় শেষ হয়ে যাবার কথা, কিন্তু তা ঘটেনি। এ পদার্থগুলির আদান প্রদান চলে প্রকৃতিতে বিদ্যামন কতকগুলো চক্রের মাধ্যমে। এগুলিকে প্রাকৃতিক চক্র বলা হয়। প্রাকৃতিক চক্রগুলি নিম্নরূপ- কার্বন চক্র, নাইট্রোজেন চক্র, পানি চক্র ইত্যাদি।

কার্বন চক্র

জীবনের মূল উপাদান হল প্রোটোপ্লাজম এবং এর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান কার্বন। কার্বন বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাস হিসেবে থাকে। বায়ুমন্ডলে এর পরিমাণ শতকরা ০.০৩ ভাগ। কার্বনের তিনটি প্রধান উৎস হল- বায়ুমন্ডল, পানি দ্রবীভূত CO_2, ভূগর্ভের খনিজ। CO_2 পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় কার্বনেট (CO_3^-) ও বাইকার্বনেট (HCO_3^-) হিসেবে থাকে। কার্বন জীব ও জড়ের মধ্যে প্রতিনিয়ত আবর্তিত অবস্থায় থাকে।

উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বায়ুমন্ডল হতে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্রহণ করে এবং শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তু তৈরিতে শর্করা ব্যবহৃত হয়। এভাবে উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় জড় পরিবেশ থেকে CO_2 গ্যাসকে জৈব যৌগে পরিণত করে।

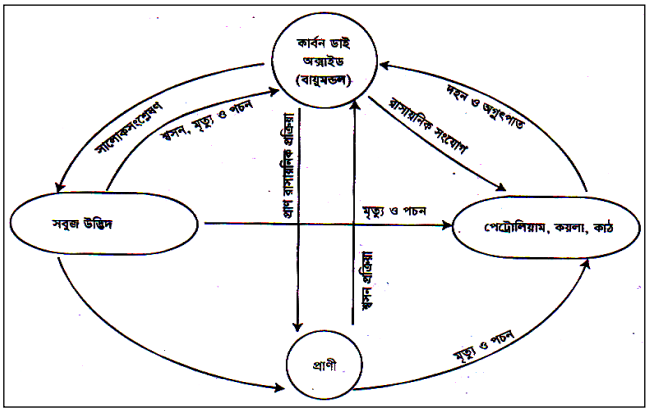

চিত্র ২২.২-১ : কার্বন চক্র

উদ্ভিদ দেহের শর্করা কোষের শ্বসন প্রক্রিয়ার জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মানুষসহ অন্যান্য প্রাণি খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। সকল প্রাণি উদ্ভিদের শর্করাকে শ্বসন প্রক্রিয়ার জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে। তাছাড়া উদ্ভিদ ও প্রাণির মৃত্যুর পর তাদের পচন ক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী অণুজীবও এ শর্করা ও অন্যান্য রাসায়নিক উপাদানকে জ্বালানী হিসবে ব্যবহার করে। আর উদ্ভিদ, প্রাণি ও অণুজীবের শ্বসন কার্যের ফলে পুনরায় কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হয় এবং বায়ুমন্ডলে ফিরে যায়।

উদ্ভিদের কাঠে প্রচুর কার্বন আছে। প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেলে আছে কার্বন। উদ্ভিদ তথা কাঠ পোড়ালে কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হয়, যা বায়ুমন্ডলে ফিরে যায়। আবার ভূগর্ভের খনিজ তথা পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি জ্বালালে কার্বন ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি হয় এবং বায়ুমন্ডলে মিশে যায়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বায়ুমন্ডল থেকে কার্বনকে কার্বন ডাই-অক্সাইড হিসেবে ধরে আনে। কার্বন বিভিন্ন মাধ্যমে স্থানান্তরের পর শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুনরায় বায়ুমন্ডলে ফিরে যায়, একে কার্বন চক্র বলে।

কার্বন চক্রের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

মানুষসহ অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণির জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন বিশুদ্ধ বায়ু। বিশুদ্ধ বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ শতকরা ০.০৩ ভাগ। তবে বায়ুর ৩.০ শতাংশ পর্যন্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড জীবের জন্য ক্ষতিকর নহে। কিন্তু এর বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুতে থাকলে মানুষের শ্বাসকষ্ট দেখা যায়। কোনো পরিবেশে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ শতকরা ২৫ শতাংশের বেশি হলে সেখানে মানুষসহ কোনো প্রাণির পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় ৬০০ কোটি লোকের বাস। এ হিসেবে প্রতিদিন প্রায় ১২০ কোটি পাউন্ড কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুতে মিশে যাচ্ছে।

জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির ফলে কলকারখানা ও গাড়ি ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস পুড়ে বছরে প্রায় ১৫০০ কোটি টন কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুতে মিশে যাচ্ছে। এর ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্বের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সাধারণত বিভিন্ন জীবের শ্বসন ক্রিয়ায় যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমন্ডলে ত্যাগ করে, উদ্ভিদ সে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গ্রহণ করে। এমনিভাবে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভারসাম্যতা রক্ষা পাবার কথা। কিন্তু জনসংখ্যা অধিকহারে বৃদ্ধির ফলে তাদের বাসস্থান, আসবাবপত্র তৈরি ও কৃষি জমি বাড়াতে ব্যাপকহারে বনাঞ্চল ধ্বংস করতে হচ্ছে। ফলে উদ্ভিদের পরিমাণ কমে যাওয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ কমে যাচ্ছে। এর ফলে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। আর বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কোনো কার্বন ডাই-অক্সাইড সূর্যালোকের ক্ষতিকর রশ্মি বিকরিত হয়ে যাবার সময় তা শোষণ করে। বিজ্ঞানীদের এক হিসেবে জানা যায় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ ১০০ বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ২৮৩ পি.পি.এম (প্রতি মিলিয়নে অংশ) থেকে ৩৩০ পি.পি.এম-এ বেড়ে যায়। এতে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ে। গত ৪০ বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হওয়াতে তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার আরও বিপদজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিজ্ঞানীদের মতে এ অবস্থা চলতে থাকলে মেরু প্রদেশে জমানো বরফ গলে সমুদ্রের উপরিতল বৃদ্ধি পাবে, ফলে মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল পানিতে ডুবে যাবে।

মানুষ তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশন, এ্যারোসল ব্যবহার করে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এসমস্ত যন্ত্রের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। এসমস্ত যন্ত্র থেকে CFC (ক্লোরো ফ্লুরো কার্বন) গ্যাস নির্গত হয়, যা বায়ুমন্ডলের ওজোন (O_3) স্তর ধ্বংসের সহায়ক। জানা গেছে CFC-র ব্যাপক ব্যবহারের ফলে ওজোন স্তরে ছিদ্র দেখা দিয়েছে। ওজোন স্তরে ছিদ্রের সৃষ্টি হলে সূর্য থেকে ক্ষতিকর অতিবেগুনীরশ্মি

পৃথিবীতে চলে আসবে, যা ত্বক ক্যান্সারসহ অন্যান্য মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

সারসংক্ষেপ

- কতগুলো প্রাকৃতিক চক্রের মাধ্যমে জীব ও জড় পরিবেশের মধ্যে সাম্যাবস্থা বজায় থাকে। প্রাকৃতিক চক্রগুলো হল- কার্বন চক্র, নাইট্রোজেন চক্র, পানি চক্র ইত্যাদি।
- জীবনের মূল উপাদান প্রোটোপ্লাজম, আর এর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান হল কার্বন। কার্বন বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস হিসেবে থাকে।
- উদ্ভিদ বায়ুমন্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গ্রহণ করে এবং শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। কার্বন বিভিন্ন মাধ্যমে জীবে স্থানান্তরের পর জীবের শ্বসন প্রক্রিয়ায় পুনরায় বায়ুতে ফিরে যায়, একে কার্বন চক্র বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বায়ুমন্ডলে কার্বন কি অবস্থায় থাকে?
ক. কার্বন খ. কার্বন ডাই-অক্সাইড গ. কার্বনিক এসিড ঘ. ক্যালসিয়াম কার্বনেট

২. বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কত?
ক. শতকরা ০.০৩ ভাগ খ. শতকরা ০.৩ ভাগ গ. শতকরা ৩.০ ভাগ ঘ. শতকরা ২৫ ভাগ

৩. উদ্ভিদ কোন প্রক্রিয়ায় বায়ুমন্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে?
ক. শ্বসন খ. প্রস্বেদন গ. অভিস্রবণ ঘ. সালোকসংশ্লেষণ

৪. বায়ুর কত শতাংশ পর্যন্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড জীবের জন্য ক্ষতিকর নহে?
ক. ৩০ শতাংশ খ. ২৫ শতাংশ গ. ৩.০ শতাংশ ঘ. ২০ শতাংশ

৫. কোন গ্যাসের ফলে ওজোন স্তর ধ্বংস হয়?
ক. কার্বন ডাই-অক্সাইড খ. কার্বন মনো-অক্সাইড গ. ক্লোরো ফ্লরো কার্বন ঘ. নাইট্রোজেন।

পাঠ ২২.৩

নাইট্রোজেন চক্র ও পানি চক্র-এদের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নাইট্রোজেন চক্র বর্ণনা করতে পারবেন;
- নাইট্রোজেন চক্রের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব আলোচনা করতে পারবেন;
- পানি চক্র বর্ণনা করতে পারবেন;
- পানি চক্রের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

নাইট্রোজেন চক্র

নাইট্রোজেন জীবের একটি অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক উপাদান। বায়ুমন্ডলে শতকরা প্রায় ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন থাকলেও উদ্ভিদ বা প্রাণি সে নাইট্রোজেন (N_2) সরাসরি বায়ুমন্ডল থেকে গ্রহণ করতে পারে না। গ্যাসীয় নাইট্রোজেন বিশেষ পদ্ধতিতে নাইট্রেট (NO_3^-) বা অ্যামোনিয়া (NH_3) তে পরিবর্তিত হয় এবং উদ্ভিদ এ অবস্থায় নাইট্রোজেন গ্রহন করে। প্রাণিকূল উদ্ভিদকূলকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করায় নাইট্রাজেন উদ্ভিদদেহ থেকে প্রাণিদেহে স্থানান্তর হয়।

উদ্ভিদ দু'প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেন শোষণ করে।

i) মটর, শিম প্রভৃতি লিগুমিনেসি পরিবারভুক্ত উদ্ভিদের মূলে বসবাসকারী রাইজোবিয়াম (*Rhizobium*) জাতীয় ব্যাকটেরিয়া গ্যাসীয় নাইট্রোজেনকে সরাসরি নাইট্রেটে (NO_3^-) পরিণত করে। পরে উদ্ভিদ নাইট্রেট শোষণ করে।

ii) মাটিতে বসবাসকারী কিছু অণুবীজ যেমন- *Azotobacter, Clostridium* এবং কিছু সায়ানোব্যাকটেরিয়া গ্যাসীয় নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়াতে পরিণত করে। পরে ঐ অ্যামোনিয়া প্রথমে নাইট্রাইট (NO_2^-) ও পরে নাইট্রেটে (NO_3^-) পরিণত হয়। উদ্ভিদ এ নাইট্রেট (NO_3^-) গ্রহণ করে।

প্রাণিরা উদ্ভিদ থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে খাদ্যবস্তু হিসেবে। উদ্ভিদ ও প্রাণির মৃত্যুর পর অণুজীবের ক্রিয়ায় জীবদেহের যৌগ পদার্থ থেকে অ্যামোনিয়া তৈরি হয়। এ অ্যামোনিয়া উদ্ভিদ গ্রহণ করে বা অ্যামোনিয়া থেকে

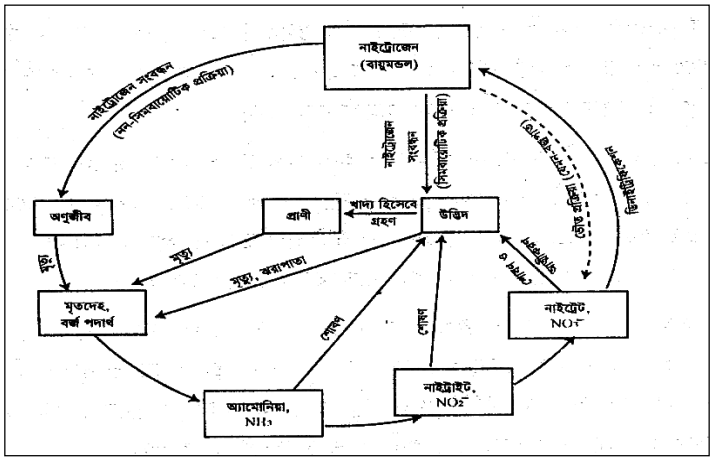

চিত্র ২২.৩-১ : নাইট্রোজেন চক্র

নাইট্রেটে (NO_3^-) রূপান্তর ঘটে। এ নাইট্রেট উদ্ভিদ গ্রহণ করে।

মাটিতে অবস্থিত নাইট্রেট (NO_3^-) অণুজীবের ক্রিয়ায় পুনরায় বায়বীয় নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত হয়ে বায়ুমন্ডলে ফিরে যায়। মাটির নাইট্রেট (NO_3^-) কে দন্ট্রোজেনে (N_2) পরিণত করার প্রক্রিয়াকে ডিনাইট্রিফিকেশন বলে।

নাইট্রোজেন চক্রের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

সমস্ত বিশ্বজুড়ে নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তাদের খাদ্য চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অতিরিক্ত জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি তৈরিতে একদিকে যেমন বনাঞ্চল ধ্বংস করা হচ্ছে তেমনিভাবে কৃষি ফসলের উৎপাদন বাড়াবার জন্য ব্যাপকহারে ব্যাবহার করা হচ্ছে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক।

কৃষি কাজে ব্যবহৃত এসমস্ত নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ সার থেকে সৌরশক্তির প্রভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তৈরি হয় নাইট্রোজেন অক্সাইড। নাইট্রোজেনের এ অক্সাইড বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অবশেষে স্ট্রাটোপোস্ফিয়ারে পৌঁছে এবং ওজোন ধ্বংস করে। মুক্ত ক্লোরিনের চেয়ে নাইট্রোজেনের ওজোন ধ্বংস করার ক্ষমতা ৬ গুণ কম। বায়ুমন্ডলে নাইট্রোজেন অক্সাইডের পরিমাণ প্রতি বছর শতকরা প্রায় ০.২৫ ভাগ করে বাড়ছে এবং এদের কর্মক্ষমতা প্রায় ১৫০ বছর পর্যন্ত বজায় থাকতে পারে। ওজোন স্তর ধ্বংসের ফলে সূর্য থেকে অতি বেগুনী রশ্মি পৃথিবীতে আসার সুযোগ পায়। এর প্রভাবে মানুষের ত্বক ক্যান্সার হতে পারে, এ ছাড়া মানুষের চোখে ছানি পড়া ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে।

পানি চক্র

পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। পানি যে কেবলমাত্র জীবদেহের গঠন বা পরিপাক প্রক্রিয়ার জন্যই অপরিহার্য তা নয়, আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপরও পানির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

পানি নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাওড়, হ্রদ, সাগর-মহাসাগর ইত্যাদি জলাশয়ে থাকে। আবার পানি জলীয় বাষ্প হিসেবে বায়ুতে থাকে। তাছাড়া ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-গর্ভে পানি আছে।

পানি সাগর থেকে বায়ুমন্ডল, বায়ুমন্ডল থেকে স্থলভাগ এবং স্থলভাগ থেকে পুনরায় সাগরে যায়। পানি এভাবে ক্রমাগত আবর্তিত হয়ে স্থলভাগে আমাদেরকে বিশুদ্ধ পানি প্রদান করে। পানির এ চক্রকে পানি চক্র বলে। পানির এ চক্র সাগর, স্থলভাগ ও বায়ুমন্ডলের মধ্যে একটি সমতা রক্ষা করে।

বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় ভূ-পৃষ্ঠের পানি জলীয় বাষ্প হিসেবে বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে। এছাড়া সাগর হতে পানি জলীয় বাষ্প হিসেবে বায়ুমন্ডলে মেঘের সৃষ্টি করে। মাটি, নদী-নালা, খাল বিল হতেও পানি বাষ্পাকারে বায়ুমন্ডলে যায়। এভাবে পানি বাষ্পীভূত হবার প্রক্রিয়াকে বাষ্পীভবন বলে। বাষ্পীভবনের প্রধান নিয়ামক সৌরশক্তি। বিভিন্ন জলাশয় ছাড়াও উদ্ভিদের প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় প্রচুর পানি বাষ্পাকারে বায়ুতে যুক্ত হয়।

বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট জলীয় বাষ্প বায়ুমন্ডলের উপরে ওঠে ক্রমশ শীতল ও ঘন হয়। একে ঘনীভবন বলে। বায়ুর আর্দ্রতা শতকরা ১০০ ভাগ হলে ঘণীভূত জলীয় বাষ্প বৃষ্টিপাত, তুষারপাত বা কুয়াশা হিসেবে স্থলভাগ ও অন্যান্য জলাশয়ে ফিরে আসে। প্রতিবছর পৃথিবীপৃষ্ঠ ও বায়ুমন্ডলের মধ্যে বিপুল পরিমাণ পানি আবর্তিত হয়। এর প্রায় তিন চতুর্থাংশ বৃষ্টিপাত হিসেবে সাগরে এবং বাকী অংশ স্থলভাগে ফিরে আসে।

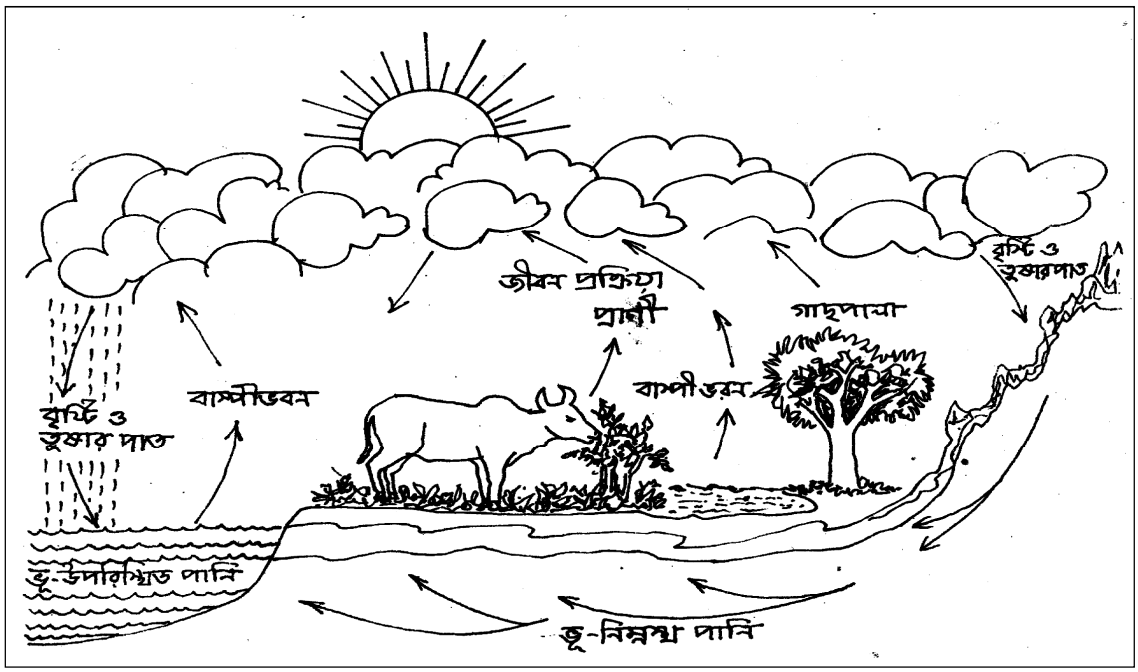

চিত্র ২২.৩-২ : পানি চক্র

পানি চক্রের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

পরিবেশের উপর পানির প্রভাব অপরিসীম। পানি আবহাওয়া ও জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে। বায়ুমন্ডলে আর্দ্রতা পরিমিত হলে তা বৃষ্টিপাত, তুষার, কুয়াশা ইত্যাদি হিসেবে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। ফলে কৃষি ফসল উৎপাদন ভালো হয়, যা জনগণের খাদ্য চাহিদা মেটায়। বৃষ্টিপাত বনাঞ্চল সৃষ্টির অন্যতম সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

উদ্ভিদ প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় বিপুল পরিমাণে পানি বাষ্পাকারে পরিবেশে ছেড়ে দেয়, ফলে বায়ুমন্ডলে আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায়। বায়ুমন্ডলে আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেলে তা বৃষ্টিপাত ঘটাতে সহায়ক হয়। এমনিভাবে উদ্ভিদ বৃষ্টিপাতের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে। এজন্য অধিক বনাঞ্চলযুক্ত এলাকায় অধিক বৃষ্টিপাত হয় এবং কম বনাঞ্চলযুক্ত এলাকায় কম বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তাদের বাসস্থান, আসবাবপত্র, খাদ্য চাহিদা মেটাতে ব্যাপকহারে বনাঞ্চল ধ্বংস করা হচ্ছে, যার ফলে পানিচক্রে বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। কাজেই এ পৃথিবীতে সুষ্ঠুভাবে বসবাসের জন্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসোপযোগী একটি সুন্দর পরিবেশযুক্ত পৃথিবী রেখে যেতে আমাদের সর্বপ্রথম জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হার রোধ করা অতীব জরুরি। এর পাশাপাশি বনাঞ্চল ধ্বংস রোধ করা প্রয়োজন।

সারসংক্ষেপ

- যে প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেন বায়ুমন্ডল থেকে মাটিতে এবং সেখান থেকে উদ্ভিদ ও অন্যান্য জীবে স্থানান্তরের পর পুনরায় বায়ুমন্ডলে মুক্ত হয়, তাকে নাইট্রোজেন চক্র বলে।
- লিগুমিনেসি পরিবারভুক্ত উদ্ভিদের মূলে অবস্থিত অণুজীব সিমবায়োসিস প্রক্রিয়ায় বায়ুমন্ডল থেকে এবং কিছু কিছু অণুজীব নন-সিমবায়োসিস প্রক্রিয়ায় সরাসরি বায়ুমন্ডল থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে।
- নাইট্রোজেনের অক্সাইড ওজোন ধ্বংসে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- পানি সাগর থেকে বায়ুমন্ডল এবং বায়ুমন্ডল থেকে স্থলভাগ এবং স্থলভাগ থেকে পুনরায় সাগরে যায়। পানির ক্রমাগত এ আবর্তনকে পানি চক্র বলে।
- গাছপালা ধ্বংসের ফলে পানি চক্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. উদ্ভিদ বায়ুমন্ডলের গ্যাসীয় নাইট্রোজেনকে (N_2)কি আকারে শোষণ করে?

ক. H_2NO_3 খ. NO গ. NO_3^- ঘ. N_2O_5

২. নিচের কোন অণুবীজ গ্যাসীয় নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়া (NH_3)তে পরিণত করে?

ক. *Azotobacter* খ. *Bacillus* গ. *Strcptomyces* sp. ঘ. *Spirullina*

৩. মাটির নাইট্রেট থেকে নাইট্রোজেন গ্যাস পরিণত হবার প্রক্রিয়াকে কি বলে?

ক. নাইট্রিফিকেশন খ. ডি-নাইট্রিফিকেশন গ. অ্যাসিমিলেশন ঘ. অ্যামোনিফিকেশন

৪. বায়ুমন্ডলে নাইট্রোজেন অক্সাইডের পরিমাণ কি হারে বাড়ছে?

ক. শতকরা ২৫ ভাগ খ. শতকরা ২০ ভাগ গ. শতকরা ০.২৫ ভাগ ঘ. শতকরা ০.১৫ ভাগ

৫. বৃষ্টিপাতের ফলে কত শতাংশ পানি স্থলভাগে ফিরে আসে?

ক. দুই চতুর্থাংশ খ. এক চতুর্থাংশ গ. তিন চতুর্থাংশ ঘ. সম্পূর্ণ।

পাঠ ২২.৪

গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গ্রীন হাউজ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া কি বলতে পারবেন;
- গ্রীন হাউজ গ্যাসগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- গ্রীন হাউজ প্রভাবের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন;
- গ্রীন হাউজ প্রভাব নিয়ন্ত্রণে করণীয় পদক্ষেপগুলি উল্লেখ করতে পারবেন।

গ্রীন হাউজ

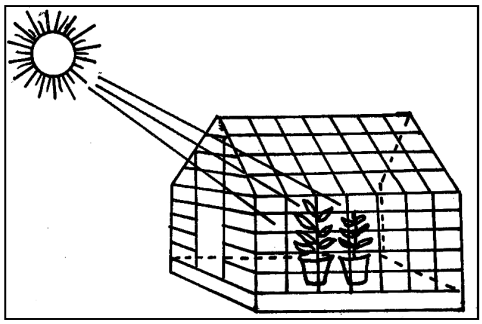

চিত্র ২২.৪-১ : গ্রীণ হাউজ

আপনারা নিশ্চয় গ্রীন হাউজ শব্দটির সাথে পরিচিত। গ্রীন হাউজ হচ্ছে এক ধরনের কাচের ঘর। নির্দিষ্ট মাত্রায় তাপ ধরে রেখে বা সৃষ্টি করে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও শাকসবজি (টমেটো, শসা, পাতাকপি, ফুলকপি, গাজর ইত্যাদি) জন্মাবার জন্যেই এটা তৈরি করা হয়। প্রধানত শীতপ্রধান দেশে এবং ইদানিং মরুময় তেল প্রধান দেশে এ ধরনের ঘর তৈরি করা হয়। পরিবেশগতভাবে এ ঘরটিতে রয়েছে সবুজের সমাহার এবং কাঁচকেও সাধারণত সবুজ দেখায় বলে এ ধরনের ঘরকে গ্রীন হাউজ বা সবুজ ঘর বলা হয়। এসব ঘরের বেড়া ও ছাউনি সবই কাঁচ দিয়ে তৈরি, ফলে সহজেই ঘরের ভিতরে আলো প্রবেশ করতে পারে। আলো প্রবেশ করায় ঘরের ভিতরের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় এবং তা কাঁচের ছাউনি ও বেড়া ভেদ করে বাইরে আসতে পারে না। ফলে, কাঁচের ঘরটি কৃত্রিমভাবে গরম থাকে এবং এর তাপমাত্রা বাইরের তাপমাত্রা থেকে বেশি থাকে। কাঁচের তৈরি এ ঘরকে গ্রীন হাউজ বলে।

গ্রীন হাউজ প্রভাব

আপনারা সকলেই জানেন সূর্যের আলো পৃথিবীকে গরম রাখে। সূর্যের আলো মহাকাশ পার হয়ে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের ভিতর দিয়ে এসে পৃথিবী পৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে। উত্তাপের বেশিরভাগ অংশ বিকিরিত হয়ে আবার মহাশূন্যে ফিরে যায়। এর ফলে পৃথিবী খুব বেশি উত্তপ্ত হতে পারে না। আবার পৃথিবীর চারিদিকের বায়ুমন্ডল কিছুটা তাপ ধরে রাখে, এজন্য পৃথিবী তাপ হারিয়ে একেবারে ঠান্ডা হয়ে যেতে পারে না। বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন ধরনের গ্যাস তাপ শোষণকারী হিসেবে কাজ করে।

বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে পৃথিবীর স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে তাপ বিকিরিত হবার কালে বায়ুমন্ডলে অবস্থিত কার্বন ডাই-অক্সাইড সে তাপ শোষণ করে। এর ফলে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যায়, একইভাবে পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।

'গ্রীন হাউজ প্রভাব' কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন সুইডিস রসায়নবিদ সোভানটে আরহেনিয়াস। শিল্প বিপ্লবের যুগে হাজার হাজার টন কয়লা পোড়ানোর ফলে যে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে মিশছে তার কুফল সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, বায়ুমন্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড যদি দ্বিগুণ হয় তবে পৃথিবীর তাপমাত্রা ৫০ সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে।

গ্রীন হাউজের ভিতরের তাপ কাঁচ ভেদ করে বাইরে বের হতে পারে না বলে গরম থাকে। একই ভাবে পৃথিবীর তাপও বায়ুমন্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড ভেদ করে মহাশূন্যে পৌঁছাতে পারে না বলে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়। গ্রীন হাউজের সাথে মিল রেখেই বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে অনুষ্ঠিত এ ঘটনার নাম দিয়েছেন গ্রীন হাউজ প্রভাব (Green House effect)।

গ্রীন হাউজ গ্যাস

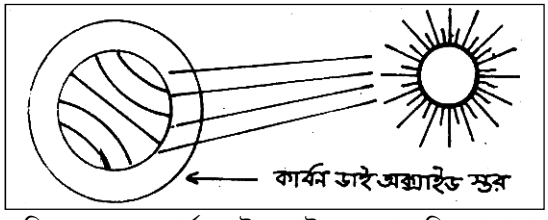

চিত্র ২২.৪-২ : কার্বন ডাই-অক্সাইড স্তর তাপ বিকরণ বাধা দিয়ে বায়ুমলকে উত্তপ্ত করছে

যে সব গ্যাস গ্রীন হাউজ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে সেগুলিকে গ্রীন হাউজ গ্যাস বলা হয়। গ্রীন হাউজ প্রভাব সৃষ্টিকারী প্রধান গ্যাস কার্বন ডাই-অক্সাইড। এ ছাড়া রয়েছে মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (সি এফ সি)। আগে মনে করা হতো কেবলমাত্র কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস গ্রীন হাউজ প্রভাব সৃষ্টির জন্য দায়ী। কিন্তু এখন জানা গেছে কার্বন ডাই-অক্সাইড এ প্রভাবের জন্য শতকরা ৫০ ভাগ দায়ী। বাকীটা অন্যান্য গ্যাসের কারণে হয়ে থাকে। শতকরা হিসেবে বিভিন্ন গ্রীন হাউজ গ্যাসের প্রভাব হল- মিথেন- ১৮%, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (সি. এফ সি)-১৪%, নাইট্রাস অক্সাইড ৬% এবং অন্যান্য কারণে ১৩%।

গ্রীন হাউজ প্রভাবের প্রতিক্রিয়া

পৃথিবী একটি গ্রহ। সবগুলি গ্রহই যথেষ্ট পরিমাণে সৌরশক্তি পেয়ে থাকে। কিন্তু কি পরিমাণ সৌরশক্তি বিকিরিত হয়ে মহাশূন্যে ফিরে যাবে তা নির্ভর করে আবহাওয়া মন্ডলের গ্যাসের উপর। বিভিন্ন গ্রীন হাউজ গ্যাস তথা কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, সি এফ সি, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি চেষ্টা করে আবহাওয়া মন্ডলের নিচের অংশে বিকিরিত সৌরশক্তি শোষণ করতে এবং এর ফলে তাপমাত্রা বেড়ে যায়।

১৮ হাজার বছর আগে সর্বশেষে বরফ যুগের শেষভাগ থেকে আজ অবধি পৃথিবীর তাপমাত্রা ৪০ সেলসিয়াস বেড়েছে। তবে পরবর্তী ষাট বছরে অর্থাৎ ২০৫০ সাল নাগাদ কোনো কোনো এলাকায় তাপমাত্রা ২ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যেতে পারে। এর ফলে পৃথিবী গত ২০ লাখ বছরের মধ্যে সবচেয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। এর লক্ষণ ইতোমধ্যেই দেখা দিয়েছে।

গ্রীন হাউজ গ্যাস বৃদ্ধির ফলে তাপমাত্রার ভবিষ্যৎ-বৃদ্ধির নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে ভিন্নমত থাকলেও তা ২০৫০ সাল নাগাদ মোটামোটি ২ থেকে ৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে বলে মনে করা যায়। কেননা আগামী ৪০ বছরে গ্রীন হাউজ গ্যাস ও তাপমাত্রা কমে যাবার উল্লেখযোগ্য কোনো লক্ষণ নেই। মনে করা হয়, বিষুব অঞ্চলের তুলনায় তুষার আবৃত মেরু অঞ্চলে তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ছে। অনুমান করা হচ্ছে ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রীন হাউজ প্রভাবের ফলে সমুদ্রের উষ্ণতা ৩০ থেকে ৪০ সেন্টিমিটার (১ ফুট থেকে সোয়া ফুট) বেড়ে যাবে। বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে, গ্রীনল্যান্ড, কানাডা ও দক্ষিণ আমেরিকার বরফ গলতে পারে। মেরু এলাকার বরফ আংশিক গলে গেলে সমুদ্রস্তরের উচ্চতা ৪ ফুট বেড়ে যাবে। গ্রীন হাউজ প্রভাবের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশেসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উপকূলীয় এলাকার এক বিরাট অংশ তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। নিউইয়র্ক, লন্ডন, বেইজিং ইত্যাদি শহরের জন্য এটা হবে মারাত্নক হুমকিস্বরূপ। ভারতমহাসাগর পৃষ্ঠ থেকে মাত্র কয়েক ফুট উচু মালদ্বীপ প্রায়ই জলোচ্ছ্বাসের শিকার হয়। গ্রীন হাউজের ফলে সমুদ্রের জলভাগ ১মিটার বৃদ্ধি পেলে উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ৫৬.০৮ লক্ষ একর জমি জলমগ্ন হবে যা দেশের মোট জমির প্রায় ১৫.৮ শতাংশ। এর মধ্যে বৃহত্তর খুলনা জেলার ৬৫%, বারিশালের ৯৯%, পটুয়াখালির ১০০%, নোয়াখালির ৪৪% এবং ফরিদপুরের ১২% জমি ডুবে যাবে। এসমস্ত অঞ্চলগুলি ডুবে যাবার ফলে প্রায় ১ কোটি মানুষ বাস্তুহারা হয়ে পড়বে।

বাতাসে গ্রীন হাউজ গ্যাস বৃদ্ধির কারণ

গ্রীন হাউজ প্রভাব সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন গ্রীন হাউজ গ্যাসগুলির মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড অন্যতম। এ ছাড়া আছে মিথেন, সি এফ সি, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি।

বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাদের বাসস্থান তৈরি, আসবাবপত্র তৈরি ও খাদ্য চাহিদা মিটাতে ব্যাপকহারে বনাঞ্চল ধ্বংস করা হচ্ছে। মানুষসহ অন্যান্য প্রাণি বায়ুমন্ডল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। অন্যদিকে সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বায়ুমন্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং উপজাত হিসেবে অক্সিজেন বায়ুমন্ডলে ত্যাগ করে। উদ্ভিদকূল ও প্রাণিকূলের এ পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে পরিবেশে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভারসাম্যতা বজায় থাকে। বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী একটি দেশের সুস্থ ও বাসোপযোগী পরিবেশের জন্য তার স্থল ভাগের শতকরা ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বিশ্বব্যাপী ধ্বংসের এক লীলাখেলা শুরু হয়েছে। এক হিসেবে দেখা গেছে বিশ্বব্যাপী বন ধ্বংসের পরিমাণ প্রতি মিনিটে ১৯০ একর। কেবলমাত্র ব্রাজিলে ৬২০ হাজার বর্গকিলোমিটার বনাঞ্চল গত এক দশকে ধ্বংস হয়েছে। বাংলাদেশের দিকে দৃষ্টি ফিরালে দেখা যাবে আরও করুনদৃশ্য। ১৯৫০ সালে বাংলাদেশে বনাঞ্চলের পরিমাণ ছিল ২৪ শতাংশ যা ১৯৭০ এর দশকে এসে দাঁড়ায় ১৬ শতাংশে। বর্তমানে বাংলাদেশের বনাঞ্চলের পরিমাণ ৯ শতাংশের কম। এমনিভাবে বনাঞ্চল ধ্বংসের ফলে উদ্ভিদ কর্তৃক বায়ুমন্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণের মাত্রা দিন দিন কমে যাচ্ছে। এর ফলে পরিবেশে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমরা হয়ে পড়ছি প্রযুক্তি নির্ভর। আর এজন্য এয়ার কন্ডিশন, রেফ্রিজারেটর, এ্যারোসল ইত্যাদি জিনিসের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বায়ুমন্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সহায়ক। এছাড়া কলকারখানা ও যানবাহনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সেখান থেকে ব্যাপকহারে কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমন্ডলে জমা হচ্ছে।

চিত্র ২২.৪-৩ : বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের ভারসাম্য রক্ষা

গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে করণীয় পদক্ষেপ

গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে করণীয় পদক্ষেপগুলি নিম্নরূপ-

- জ্বালানী শক্তি সংরক্ষণের মাধ্যমে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গমণ বন্ধ করা।
- সৌর, পানি, বায়ু ও পারমাণবিক শক্তির ন্যায় বার বার ব্যবহারযোগ্য শক্তি ব্যবহার করা।
- কার্বন ডাই-অক্সাইড জ্বালানীর ব্যবহার কম করা এবং বিকল্প জ্বালানী (যেমন-গ্যাস) আবিষ্কার ও তার ব্যবহার করা।

- বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও নিয়মিত বনায়নের মাধ্যমে নতুন নতুন বনাঞ্চল সৃষ্টি করা।
- কৃষি ক্ষেত্রে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি করা।
- সি. এফ সি ব্যবহার বন্ধ করা ও বিকল্প পথ আবিষ্কার করা।
- গ্রীন হাউজ প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা ও এ প্রভাব সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করা।

সারসংক্ষেপ

- কৃত্রিমভাবে সৌরতাপকে আটকে রেখে কাঁচের তৈরি ঘরে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ জন্মাবার ব্যবস্থা করা হয়। কাঁচের তৈরি এ ঘরকে গ্রীন হাউজ বলে।
- গ্রীন হাউজের ভিতরের তাপ কাঁচ ভেদ করে বের হতে পারে না বলে ঘর গরম থাকে। তেমনিভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে বিকরিত তাপ বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড অতিক্রম করে মহাশূন্যে যেতে পারে না, ফলে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়।
- গ্রীন হাউজ গ্যাসগুলির মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড অন্যতম, এছাড়া মিথেন, সি এফ সি, নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাসও এর অন্তর্ভুক্ত।
- গ্রীন হাউজ গ্যাসের ফলে বিশ্বব্যাপী বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। বাংলাদেশে মরুকরণ, জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি এর ফলে ঘটছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. গ্রীন হাউজ কি?

ক. সবুজ পাকা ঘর খ. সবুজ কাঁচা ঘর গ. কাঁচের নির্মিত ঘর ঘ. সবুজ কাঠের ঘর

২. কি উদ্দেশ্যে গ্রীন হাউজে গাছ লাগান হয়?

ক. পোকা-মাকড় থেকে রক্ষা করতে খ. ঝড় বৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে
গ. উত্তাপ থেকে রক্ষা করতে ঘ. শীত থেকে রক্ষা করতে

৩. বায়ুমন্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য দায়ী কোনটি?

ক. কার্বন ডাই-অক্সাইড খ. অক্সিজেন গ. হাইড্রোজেন ঘ. সালফার ডাই-অক্সাইড

৪. তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য মিথেন গ্যাসের প্রভাব কত শতাংশ?

ক. ১৪ শতাংশ খ. ১৮ শতাংশ গ. ৫০ শতাংশ ঘ. ৬ শতাংশ

৫. সমুদ্রে পানির উচ্চতা ১ মিটার বাড়লে বাংলাদেশে কি পরিমাণ জমি ডুবে যাবে?

ক. প্রায় ৫০.০৭ লক্ষ একর খ. প্রায় ৬০ লক্ষ একর
গ. প্রায় ৫৬.০৮ লক্ষ একর ঘ. প্রায় ৪৮.০৮ লক্ষ একর।

পাঠ ২২.৫

পরিবেশ সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিবেশ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- পরিবেশ সংরক্ষণে করণীয় পদক্ষেপগুলি আলোচনা করতে পারবেন।

পরিবেশ

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই আমাদের পরিবেশ। অন্যভাবে বলা যায় পৃথিবীর সবকিছু তথা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ওজোনস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বিদ্যমান আলো, বাতাস, পানি, শব্দ, মাটি, বন পাহাড়, নদ-নদী, সাগর, মানব নির্মিত অবকাঠামো এবং গোটা উদ্ভিদ ও জীবজগত একত্রে যা সৃষ্ট তাই পরিবেশ। পরিবেশকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়- জীব পরিবেশ ও জড় পরিবেশ। যে সব বস্তুর প্রাণ নেই যেমন- মাটি, পানি, বাতাস, চাঁদ, সূর্য ইত্যাদি জড় পদার্থ। এসব জড় পদার্থ নিয়েই জড় পরিবেশ। পরিবেশের বিভিন্ন জীবজন্তু ও গাছপালার জীবন আছে। এদের নিয়ে তৈরি হয়েছে জীব পরিবেশ। কাজেই দেখা যচ্ছে জড় ও জীব নিয়েই সামগ্রিকভাবে গঠিত হয় পরিবেশ। পরিবেশ ব্যবস্থায় প্রধানত চারটি প্রধান অংশ বিদ্যমান যথা- ১. জড় পদার্থ (যেমন- সূর্য, পানি, মাটি, গ্যাস ইত্যাদি), ২. গাছপালা ও উদ্ভিদ, ৩. ব্যবহারকারী (মানুষসহ অন্যান্য প্রাণি) ও ৪. বিয়োজকসমূহ বা রূপান্তরকারকসমূহ (যেমন- ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ)।

মানুষ পরিবেশের একটি অংশ এবং জীবজগতসহ মানুষের জন্যেই পরিবেশ। পরিবেশ জীবজগতের স্বাভাবিক জন্ম, স্থিতি, বংশবৃদ্ধি ও মৃত্যুকে প্রভাবিত করে। পরিবেশের সকল উপাদান একে অপরের সহযোগীতার মাধ্যমে টিকে আছে, এভাবে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে।

পরিবেশ মানুষের জন্যে তিনটি মৌলিক কাজ করে।

প্রথমত : বাতাসসহ মানুষের থাকার জায়গা দেয় এবং অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করে।

দ্বিতীয়ত : পরিবেশ হচ্ছে, কৃষি, খনিজ, পানি এবং অন্যান্য সম্পদের উৎস যা মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করে।

তৃতীয়ত : পরিবেশ মানব সৃষ্ট সব আবর্জনা গ্রহণকারী হিসেবে কাজ করে।

পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

পরিবেশ আমাদের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। বেঁচে থাকার সকল উপাদান আমরা পরিবেশ থেকে পেয়ে থাকি। বিভিন্ন পরিবেশে নির্দিষ্ট জীব গড়ে ওঠে। যেমন– নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর প্রভৃতি জলচর প্রাণির প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। কিন্তু এ পরিবেশে স্থলচর প্রাণিরা বেঁচে থাকতে পারে না। মরুভূমিতে পানির অভাব, তাই সেখানে সকল উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না, নির্দিষ্ট প্রজাতির কিছু উদ্ভিদ ঐ সমস্ত এলাকায় জন্মায়। আমরা লক্ষ করলে দেখতে পাই সুন্দরবনের লবণাক্ত পরিবেশে যেসব উদ্ভিদ ও প্রাণি জন্মে সিলেট বা চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলে সেসকল উদ্ভিদ ও প্রাণি দেখা যায় না। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশে যে সব জীব জন্মায় বা বাস করে তাদের স্বাতন্ত্র্য থাকে। এ রকম বিভিন্ন জীবের (উদ্ভিদ বা প্রাণি) সমষ্টি নিয়ে গড়ে ওঠে জীব সম্প্রদায় (biotc community)। প্রতিটি জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্ভিদ, প্রাণি ও বিভিন্ন অণুজীব আছে। এরা একে অপরের সহযোগিতায় বেঁচে থাকে। কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের

জলবায়ু কেমন হবে তা নির্ভর করে ঐ অঞ্চলের উদ্ভিদের উপর।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা জানতে পারলাম প্রতিটি জীবের (উদ্ভিদ বা প্রাণি) স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। তারা পরিবেশ থেকে যে বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ করে তা আবার সম্পূর্ণভাবে পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়। একারণে পরিবেশে জড় ও জীব উপাদানের কোনো একটির অভাব হলে তার উপর নির্ভরশীল উদ্ভিদ ও প্রাণির বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেমন- পরিবেশে অণুজীব না থাকলে বা কোনো কারণে ধ্বংস হয়ে গেলে ঐ পরিবেশ জীবের বাসের অনুপোযোগী হয়ে পড়বে, কেননা উদ্ভিদ ও প্রাণির পরিত্যক্ত বর্জ্যকে অণুজীবগুলি পচনে সহায়তা করে। তাছাড়া জীবের মৃত্যুর পর তাদের পচন ক্রিয়া ঘটায় এসকল অণুজীবরা।

পরিবেশ অবক্ষয় বা পরিবেশ ধ্বংসের জন্য প্রাকৃতিক কারণগুলি পাশাপাশি মানুষ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বিশ্বব্যাপী আজ জনসংখ্যা বৃদ্ধি এক প্রকট সমস্যা। আর এ বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে মানুষ নির্বিচারে বনাঞ্চল ধ্বংস করছে। মানুষ তার পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিত্য নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। এর দ্বারা বাড়ছে কল-কারখানা, বাড়ছে যানবাহন, বাড়ছে নগরায়ন। এর ফলশ্রুতিতে পরিবেশে কার্বন ডাই-অক্সাইডসহ অন্যান্য গ্রীন হাউজ গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা মেরু অঞ্চলের বরফ গলিয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হার বাড়াচ্ছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে আমরা যদি এখন সচেতন না হই তাহলে আগামীদিনে এ পৃথিবী বাসের অনুপোযোগী হয়ে পড়বে। এজন্য এ পৃথিবীতে আমাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক বসবাস নিশ্চিত করতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর শান্তিময় পৃথিবী রেখে যেতে পরিবেশ সংরক্ষণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবেশ সংরক্ষণে করণীয় পদক্ষেপ

পরিবেশ অবক্ষয় ও পরিবেশ দূষণ কেবলমাত্র উন্নত বিশ্বের সমস্যা নয়, এটা সারা বিশ্বের সমস্যা, বাংলাদেশ এর বাইরে নয়। এক দেশে একজাতি পরিবেশ অবক্ষয় ঘটালে তার ক্ষতিকর প্রভাব পার্শ্ববর্তী দেশ, পার্শ্ববর্তী জাতির উপর পড়তে পারে বা তা ছড়িতে পড়তে পারে অনেক দূরে।

বাংলাদেশের দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সম্পদ হ্রাসের সাথে দারিদ্র বৃদ্ধি বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টির অন্যতম কারণ। এছাড়া বিভিন্ন পরিবেশগত হুমকির প্রভাবে বাংলাদেশ আক্রান্ত হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এগুলো হলো- গ্রীন হাউজ প্রভাব, ওজোন স্তর ক্ষয়, মরুকরণ, বর্ধিত লবণাক্ততা, মানুষের স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহানি, আর্থসামাজিক অবস্থার অবনতি ইত্যাদি। আমরা সুষ্ঠুভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাব এ গুলোর অধিকাংশই কিন্তু আমাদের দেশে শুরু হয়ে গেছে। কাজেই এসমস্ত পরিবেশগত হুমকি থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। নিচে পরিবেশ সংরক্ষণে করণীয় পদক্ষেপগুলি আলোচনা করা হলো।

- জাতীয় পরিবেশ নীতি প্রণয়ন।
- বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ যেমন- রাস্তা, ঘাট নির্মাণ, বাঁধ তৈরি, বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন, নগরায়ন, ইত্যাদি বাস্তবায়নের আগে পরিবেশগত প্রভাব নিরুপণ করা।
- দেশের সমস্ত ভূমি ব্যবহার পরিবেশসম্মতভাবে ও সুপরিকল্পিতভাবে করা।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো ও তা ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা।
- দেশের জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
- গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিসহ সার্বিক গ্রাম উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া।
- শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্যহারে বাড়ানো।
- শিল্প প্রতিষ্ঠান আবাসিক এলাকা থেকে দূরে স্থাপন করা।
- শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পূর্বে তার বর্জ্য পরিশোধন নিশ্চিত করা।
- কাঠের বিকল্প জ্বালানীর ব্যবহার বৃদ্ধি করা।
- ব্যাপকহারে গাছলাগানোর মাধ্যমে বনায়ন সৃষ্টি করা।

- কৃষি জমিতে রাসায়নিক সার, কীটনাশকের পরিবর্তে জৈব সার ও জৈব প্রক্রিয়ায় কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করা।
- বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ ও আরো অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠা করা।
- স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত পাঠ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত করা।
- পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রেডিও, টেলিভিশনে বিভিন্ন পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয় প্রচার করা।
- পৌর, বাণিজ্যিক ও গৃহস্থালীর বর্জ্যের নিরাপদ অপসারণ নিশ্চিত করা।

সারসংক্ষেপ

- আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠে থেকে ওজোনস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বিদ্যমান আলো, বাতাস, পানি, শব্দ, মাটি, বন পাহাড়, মানব নির্মিত অবকাঠামো এবং উদ্ভিদকূল একত্রে মিলে পরিবেশ গঠিত।
- পরিবেশ দু'প্রকার- জীব পরিবেশ ও জড় পরিবেশ।
- আমরা বেঁচে থাকার সকল উপাদান পরিবেশ থেকে পেয়ে থাকি। আমাদের সুস্থ বাসস্থানের জন্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুন্দর পৃথিবী উপহার দিতে পরিবেশ সংরক্ষণ প্রয়োজন।
- পরিবেশ সংরক্ষণে প্রধান করণীয় বিষয় হলো- জনগণকে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. পরিবেশ কত প্রকার?
ক. দু'প্রকার খ. তিন প্রকার গ. চার প্রকার ঘ. পাঁচ প্রকার

২. নিচের কোনটি বিয়োজক হিসেবে কাজ করে?
ক. ব্যাকটেরিয়া খ. শৈবাল গ. প্লোটোজোয়া ঘ. উদ্ভিদ

৩. নির্দিষ্ট পরিবেশে বিভিন্ন জীব সমষ্টি কি গড়ে তোলে?
ক. উদ্ভিদ সম্প্রদায় খ. প্রাণি সম্প্রদায়গ. জীব সম্প্রদায় ঘ. মানব সম্প্রদায়

৪. নিচের কোনটি বিশ্বব্যাপী প্রকট সমস্যা?
ক. বায়ু দূষণ খ. শব্দ দূষণ গ. কল-কারখানা স্থাপন ঘ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি

৫. পরিবেশ সংরক্ষণে প্রধান করণীয় উপায় কোনটি?
ক. নগরায়ন খ. বনায়ন গ. দারিদ্র দূরীকরণ ঘ. জনগণের পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

পাঠ ২২.৬

দুরারোগ্য রোগ : এইডস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- এইডস কি বলতে পারবেন;
- এইডস এর কারণগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- এর লক্ষণগুলো নিরুপণ করতে পারবেন;
- এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।

এইডস

বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা অধিক হারে বৃদ্ধির ফলে যথাযথভাবে তাদের সকল চাহিদা পূরণ সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য মানুষের খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, চিকিৎসা ব্যবস্থা দারুনভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। অপুষ্টি, শিক্ষার অভাব, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না থাকায় মানুষ দিন দিন হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ছে। ফলে মানুষের মধ্যে অসামাজিক কার্যকলাপ, মাদকদ্রব্য (যেমন- হেরোইন, ফেনসিডিল, প্যাথেডিন, গাজা, ভাং ইত্যাদি) গ্রহণ ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি মানুষ এখন নেশাদ্রব্য হিসেবে টিকটিকির লেজ খাওয়া শুরু করেছে। এ সমস্ত কারণে বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগ যেমন- এইডস, ক্যান্সার, ব্রেইন টিউমার প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। এসমস্ত রোগের ভালো চিকিৎসা ব্যবস্থা তথা উপযুক্ত ওষুধ এখনও বিশ্বব্যাপী আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। চিকিৎসা ব্যবসার যতটুকু অগ্রগতি ঘটেছে তা হলো মানুষের মৃত্যুকে স্বল্প সময়ের জন্য ঠেকিয়ে রাখা। একারণে এসমস্ত রোগকে দুরারোগ্য রোগ বলা হয়। এগুলোর মধ্যে ঘাতক ব্যাধী হিসেবে এইডস বিশ্বব্যাপী আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে।

আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে যার কারণে আমরা কোনো রোগে আক্রান্ত হলে ঐ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বলে একটা সময়ে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে উঠি। যদি কোনো কারণে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে তা হলে আমাদের আরোগ্য লাভের তেমন কোনো সুযোগ থাকে না। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে গেলে তা আর সারিয়ে তোলার চিকিৎসা ডাক্তারদের আজও অজানা। তাই তারা মানব দেহের এ নাজুক ও অসুস্থ অবস্থাকে নাম দিয়েছেন এইসড (AIDS) ।

AIDS শব্দটি Acquired Immune Deficiency Syndrome এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এইডস হচ্ছে এক প্রকার সংক্রামক রোগ যা HIV (Human Immuno Deficiency Virus) নামক ভাইরাস দিয়ে হয়ে থাকে। এই ভাইরাস দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নষ্ট করে দেয়, এ রোগের কারণে সেলুলাস ইম্যুউনিটি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং রক্তরসে লিম্ফোসাইট-এর সংখ্যা কমিয়ে দেয়। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির দেহ অন্যান্য কোনো রোগ প্রতিরোধ করতে পারে না ফলে রোগী মারা যায়।

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ১৯৮১ সালে রোগটি আবিষ্কৃত হয়। UNAIDS এর এক পরিসংখ্যান মতে জানা যায় সারাবিশ্বে বর্তমানে ২ কোটি ৩০ লক্ষেরও বেশি লোক HIV দ্বারা আক্রান্ত। এর মধ্যে ৪০ শতাংশ নারী। অপর এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, বিশ্বে এ পর্যন্ত HIV পজিটিভ নিয়ে পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হয়েছে ২০ লাখেরও বেশি শিশু যাদের বয়স ১৫ বছরের নিচে। ১৯৯৬ সালে এইডস রোগে বিশ্বে ১০ লাখ ৫০ হাজার লোক মারা যায়। এদের মধ্যে ১৫ বছরের কম বয়সের শিশুর সংখ্যা ছিল ৩ লাখ ৫০ হাজার। ১৯৯৬ সালের এক হিসেবে জানা যায় ৯০ লাখ শিশু তার মাকে হারিয়েছে এইডস এর কারণে। এর মধ্যে ৯০ ভাগ শিশু বাস করে আফ্রিকার সাহারা অঞ্চলে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের শতাধিক (১০২ জন) লোকের শরীরে HIV পাওয়া গেছে। এর মধ্যে এইডস আক্রান্ত হয়েছে ১০ জন এবং মারা গেছে ৬ জন। সারা পৃথিবীতে এখন প্রতি ৫ সেকেন্ডে ১ জন HIV দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে।

এইডস রোগের কারণসমূহ

HIV দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত, যৌনরস ও দুধের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করতে পারে। অসাবধান যৌনমিলন এ রোগ বিস্তারের অন্যতম কারণ। তবে যোনীপথে যৌনমিলনের চেয়ে পায়ুপথে যৌনমিলনের মাধ্যমে এরোগ বেশি বিস্তার লাভ করে। এইডস এর কারণ সমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো-

- এইডস আক্রান্ত পুরুষ বা মহিলার সাথে খোলা যৌনমিলনের মাধ্যমে।
- এইডস রোগীর রক্ত সুস্থ মানুষের শরীরে প্রবেশের ফলে।
- HIV যুক্ত ইনজেকশন সিরিঞ্জ, সূঁচ ও অপারেশন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে।
- এইডস আক্রান্ত মায়ের গর্ভে অবস্থিত সন্তানে এ রোগ স্থানান্তরিত হয়। এমনকি আক্রান্ত মায়ের দুধ থেকে তার সন্তানের মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে।
- এইডস রোগের লক্ষণ প্রকাশে বিলম্ব হওয়ার কারণে আক্রান্ত ব্যক্তি সহজে এরোগ অন্যের দেহে ছড়াতে পারে।
- আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তের সংগে সুস্থ ব্যক্তির রক্তের সংস্পর্শ ঘটলে, যেমন- উভয়ের কাটা, ফোঁড়া, ঘা, ক্ষত ইত্যাদির মাধ্যমে। টুথ ব্রাশ, সেভিং রেজার, ব্লেড, কান ও নাক ফোঁড়ার সূঁচ ইত্যাদি একে অপরের ব্যবহারের ফলেও HIV ছড়াতে পারে।
- শিরায় নেশা দ্রব্য গ্রহণ করলে।
- যৌন ব্যাধি যেমন- সিফিলিস, গনোরিয়া ইত্যাদি এইডস সংক্রমনে সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

এইডস রোগের লক্ষণসমূহ

এইডস রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় অনেক দেরিতে অর্থাৎ HIV দ্বারা আক্রান্ত হবার ছয়মাসের মধ্যে এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। নিচে এইডস-এর লক্ষণসমূহ লিপিবদ্ধ করা হলো-

- শরীরের ওজন অতিদ্রুত হ্রাস পায় এবং ওজন শতকরা ১০ ভাগেরও বেশি কমে যায়।
- এক মাসের বেশি সময় ধরে একটানা পাতলা পায়খানা হতে থাকে।
- এক মাসের বেশি সময় ধরে একটানা জ্বর হয় অথবা জ্বর জ্বর ভাব হয়।
- দীর্ঘ সময় ধরে একটানা শুকনা কাশি।
- অতিরিক্ত অবসাদ অনুভব করা।
- সারাদেহ চুলকানিজনিত চর্মরোগ।
- ঘাড় ও বগলে অসহ্য ব্যথা হওয়া।
- মুখ ও গলায় ফেনাযুক্ত একধরনের ঘা হওয়া।
- মুখমন্ডল অস্বাভাবিক রুক্ষ হওয়া।
- শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ বা ইন্দ্রিয় বিশেষ করে মুখমন্ডল, নাক, চোখের পাতা ইত্যাদি অস্বাভাবিকভাবে ফুলে যাওয়া।

এইডস রোধের উপায়

এইডস রোগ হয় HIV দ্বারা আক্রমণের ফলে এবং HIV সংক্রমণের সর্বশেষ পর্যায় হল এইডস। এইডস আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু অনিবার্য তাই এ রোগকে ঘাতক রোগ বলে। এইডস রোগের কোনো ওষুধ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। এজন্য এইডস প্রতিরোধের প্রধান উপায় হবে এইডস সংক্রমণের কারণগুলি থেকে বিরত থাকা। নিচে এইডস রোধের উপায়গুলি উল্লেখ করা হলো-

- নারীপুরুষের অবাধ-মেলামেশা রোধ করা অর্থাৎ বহুগামী নারী পুরুষের সাথে যৌনমিলন থেকে বিরত থাকা।
- যৌন ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকা।

- শরীরে রক্ত গমণের পূর্বে তা এইডস ভাইরাস (HIV) মুক্ত কিনা নিশ্চিত হওয়া।
- HIV মুক্ত ইনজেকশনের সূঁচ, সিরিঞ্জ ও অপারেশন যন্ত্রপাতি ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- একই সূঁচ একাধিক ব্যক্তির শরীরে ইনজেকশনে ব্যবহার না করা।
- সমকামিতা বর্জন করা।
- এইডস সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

সারসংক্ষেপ

- AIDS হচ্ছে Acquired Immune Deficiency Syndrome এর সংক্ষিপ্ত রূপ। শরীরে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে গেলে তা আর সারিয়ে তোলার চিকিৎসা ডাক্তারদের আজও অজানা। তাই তারা মানবদেহের এ নাজুক ও অসুস্থ অবস্থাকে নাম দিয়েছেন এইডস (AIDS)
- এইডস হচ্ছে একপ্রকার সংক্রামক রোগ যা HIV নামক ভাইরাস দিয়ে হয়ে থাকে।
- সারাবিশ্বে বর্তমানে ২ কোটি ৩০ লক্ষের বেশি লোক HIV দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এদের মধ্যে ৪০ শতাংশ নারী।
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ১০২ জনের শরীরে HIV পজেটিভ পাওয়া গেছে।
- অসাবধান যৌনমিলন এইডস রোগ বিস্তারের অন্যতম কারণ, তবে যৌনপথে মিলনের চেয়ে পায়ুপথে মিলনের মাধ্যমে এরোগ বেশি বিস্তার লাভ করে।
- HIV দ্বারা সংক্রমণের সর্বশেষ পর্যায় হলো এইডস। এইডস একটি মরণ ব্যাধি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিচের কোনটি দুরারোগ্য রোগ?
ক. আমাশয় খ. এইডস গ. টাইফয়েড ঘ. কলেরা

২. নিচের কোন ভাইরাস দ্বারা এইডস হয়ে থাকে।
ক. TMV খ. টুংরো ভাইরাস গ. ইবোলা ভাইরাস ঘ. HIV

৩. এইডস রোগ সর্বপ্রথম কোন সালে আবিষ্কৃত হয়?
ক. ১৯৮১ সালে খ. ১৯৯১ সালে গ. ১৯৬১ সালে ঘ. ১৯৮৩ সালে

৪. সারাবিশ্বে বর্তমানে কতসংখ্যক লোক HIV দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে?
ক. ১ লোকটি ৪০ লাখ খ. ২ কোটি ৪০ লাখ গ. ২ কোটি ৩০ লাখ ঘ. ৩ কোটি ৩০ লাখ।

৫. বাংলাদেশে বর্তমানে কতজন HIV দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে?
ক. ১১০ জন খ. ১০২ জন গ. ২০২ জন ঘ. ১০৩ জন।

৬. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত এইডস দ্বারা কতজন মারা গেছে?
ক. ১০ জন খ. ৮ জন গ. ৯ জন ঘ. ৬ জন।

পাঠ ২২.৭

জনসংখ্যা সমস্যা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জনসংখ্যা তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি বলতে পারবেন;
- জনসংখ্যার শূন্য বৃদ্ধি হার ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- জনসংখ্যা পিরামিড বর্ণনা করতে পারবেন।

জনসংখ্যা তথ্য সংগ্রহ

কোনো নির্দিষ্ট এলাকার জনসংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করার আগে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য জানা প্রয়োজন। যেমন, সে এলাকায় কতজন লোক বাস করে, তাদের মধ্যে কতজন পুরুষ, কতজন নারী, তাদের কার বয়স কত, প্রতি বছর কতজন শিশু জন্মগ্রহণ করে, কতজন মারা যায়, প্রতিবছর কতজন বিদেশে চলে যায় এবং কতজন বিদেশ থেকে আসে ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্য। এছাড়া জানা প্রয়োজন তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শারীরিক অবস্থা। এজন্য বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সেগুলো হচ্ছে-

- আদমশুমারী
- আবশ্যকীয় তালিকাভুক্তি
- নমুনা জরিপ

কোনো এলাকায় বা কোনো দেশে কতজন লোক বাস করে তা জানার সহজ উপায় হচ্ছে ঐ এলাকা বা দেশে বসবাসকারী প্রতিটি লোক গণনা করা এবং আদমশুমারীতে প্রকৃতপক্ষে এ কাজটি করা হয়ে থাকে। তবে লোক গণনার সাথে সাথে তাদের মধ্যে কতজন পুরুষ, কতজন মহিলা, কার বয়স কত, প্রতিবছর কতজন শিশু জন্মগ্রহণ করে, কতজন মারা যায় ইত্যাদি তথ্যও সংগ্রহ করা হয়। একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর আদমশুমারী করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে ১০ বছর পর পর আদমশুমারী করা হয়। প্রথম আদমশুমারী করা হয় ১৯৭৪ সালে। এরপর ১৯৮১ সালে এবং সর্বশেষ ২০১১ সালে।

দেশের প্রতিটি এলাকায় প্রতিদিনই কিছু শিশু জন্মগ্রহণ করছে, আবার কিছু লোক মারা যাচ্ছে। দেশের কোনো এলাকা থেকে কিছু লোক বিদেশে চলে যাচ্ছে আবার অনেক বিদেশি লোক এখানে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। এগুলি তালিকাভুক্তি করা হয়। এসব তালিকাভুক্তি করাকেই বলে আবশ্যকীয় তালিকাভুক্তিকরণ। এভাবে লোকের স্থানান্তরকে তালিকাভুক্তিকরণের মাধ্যমেই আদমশুমারীর মধ্যবর্তী কোনো সময়ের জনসংখ্যা সম্পর্কে জানা যায়। আদমশুমারী ও তালিকাভুক্তিকরণে অনেক ব্যয় হয়। তাই আজকাল নমুনা জরিপ পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়। নমুনা জরিপে দেশের প্রতিটি মানুষকে গণনা করার পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট এলাকার সকল মানুষকে গণনা করা হয় এবং ঐ প্রাপ্ত ডাটা থেকে সমগ্র দেশের জনসংখ্যা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবেই নমুনা জরিপ পদ্ধতিতে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু এলাকা বাছাই করার ক্ষেত্রে তা যেন প্রতিনিধিত্বকারী হয় সে সম্পর্কে সতর্ক থাকলে এ ভুলের পরিমাণ কমানো সম্ভব। আপনি যে এলাকায় বসবাস করেন সে এলাকার জনসংখ্যা সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য একটি জরিপ কাজ সহজেই করতে পারেন। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ছক ব্যবহার করতে হয়। নিচে একটি নমুনা ছক দেওয়া হল-

১. পরিবারের কর্তা/প্রধান-এর নাম :

পেশা :

আয় (বাৎসরিক) :
বয়স :
শিক্ষাগত যোগ্যতা :
বৈবাহিক অবস্থা :
ধর্ম :

২. পরিবারের সদস্য সংখ্যা

ক্রম	নাম	বয়স	সম্পর্ক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	আয়(বাৎসরিক)
ক.					
খ.					
গ.					
ঘ.					
ঙ.					

জনসংখ্যার শূন্য বৃদ্ধি হার

কোনো দেশের যে কোনো বছরে মোট জীবন্ত শিশু জন্মের সংখ্যা এবং সেই বছরের মধ্যবর্তী সময়ের জনসংখ্যার অনুপাতকে স্থূল জন্মহার বলে। এ অনুপাতকে সাধারণত ১০০০ দিয়ে গুণ করা হয়। কাজেই,

$$\text{স্থূল জন্মহার} = \frac{\text{কোন বছরে জীবন্ত জন্মসংখ্যা}}{\text{একই বছরের মধ্যে সময়ের জনসংখ্যা}} \times ১০০০ = \frac{B}{P} \times ১০০০$$

একইভাবে,

$$\text{স্থূল মৃত্যুহার} = \frac{\text{কোন বছরে জীবন্ত মৃত্যুসংখ্যা}}{\text{একই বছরের মধ্যে সময়ের জনসংখ্যা}} \times ১০০০ = \frac{D}{P} \times ১০০০$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{এখানে, কোনো বছরে জীবন্ত শিশু জন্মসংখ্যা} = B \\ \text{কোনো বছরে মৃত্যু সংখ্যা} = D \\ \text{একই বছরের মধ্য সময়ের জনসংখ্যা} = P \end{array}\right]$$

স্থূল জন্মহার এবং স্থূল মৃত্যুহারের পার্থক্যকে বলা হয় জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার। এছাড়া কোনো দেশের জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির আর একটি প্রক্রিয়া আছে, যাকে দেশান্তর বলে। কোনো দেশ থেকে লোক বিভিন্ন কারণে অন্য দেশে চলে যায়। আবার অন্য দেশ থেকে কিছু কিছু লোক সে দেশে আসে। যেমন বাংলাদেশ থেকে বর্তমানে অনেক লোক মধ্যপ্রাচ্য, আমেরিকা, কানাডায় চলে যাচ্ছে। কোনো দেশ থেকে লোক বাইরে চলে যাওয়াকে বলে বহির্গমন এবং অন্য দেশ থেকে সে দেশে চলে আসাকে বহিরাগমন বলে। বহিরাগমন থেকে বহির্গমন বিয়োগ করলে নীট দেশান্তর পাওয়া যায়। আর জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি হারের সাথে দেশান্তর হার যোগ বা বিয়োগ করলে পাওয়া যায় প্রকৃত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। বহিরাগমন অপেক্ষা বহির্গমন সংখ্যা কম হলে, দেশান্তর হার স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের সাথে যোগ করতে হবে; এ ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার স্বাভাবিক বৃদ্ধি হার অপেক্ষা বেশি হবে। অন্য দিকে বহিরাগমন অপেক্ষা বহির্গমন বেশি হলে দেশান্তর হার স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের সাথে বিয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার স্বাভাবিক বৃদ্ধি হার থেকে কম হবে।

দেশান্তর উল্লেখযোগ্য না হলে, অর্থাৎ বহির্গমন ও বহিরাগম সমান হলে, স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সমান হবে। এরূপ ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট বছরে জন্মসংখ্যা ও মৃত্যুসংখ্যা সমান হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার হবে শূন্য। একেই বলা হয় জনসংখ্যা শূন্য বৃদ্ধি হার। আমাদের দেশ বাংলাদেশের কথা চিন্তা করলে দেখা যায়, এখানে বহির্গমনের হার বহিরাগমনের হারের তুলনায় বেশি। কাজেই বাংলাদেশে জন্মসংখ্যা মৃত্যুসংখ্যা থেকে আনুমানিক হারে বেশি হলেও শূন্য বৃদ্ধি হার বজায় থাকা সম্ভব। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডার মত দেশে বহির্গমন থেকে বহিরাগমন বেশি, সেক্ষেত্রে জনসংখ্যা শূন্য বৃদ্ধি হার

বজায় রাখতে হলে জন্মসংখ্যা মৃত্যুসংখ্যা থেকে কম হতে হবে।

একবিংশ শতাব্দিতে বিশ্বের অধিকাংশ দেশের লক্ষ্য হচ্ছে জনসংখ্যা শূন্য বৃদ্ধি হার বজায় রাখা। অনেক দেশ ইতোমধ্যে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কাছাকাছি পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। বাংলাদেশের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে প্রতি দম্পতির জন্য ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানে সীমিত রাখা। অর্থাৎ পিতা মাতার মৃত্যুর পর তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে দু'সন্তান। এর দ্বারা জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না। কিন্তু এ প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ। তাই এখন জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জন্মহার কমানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

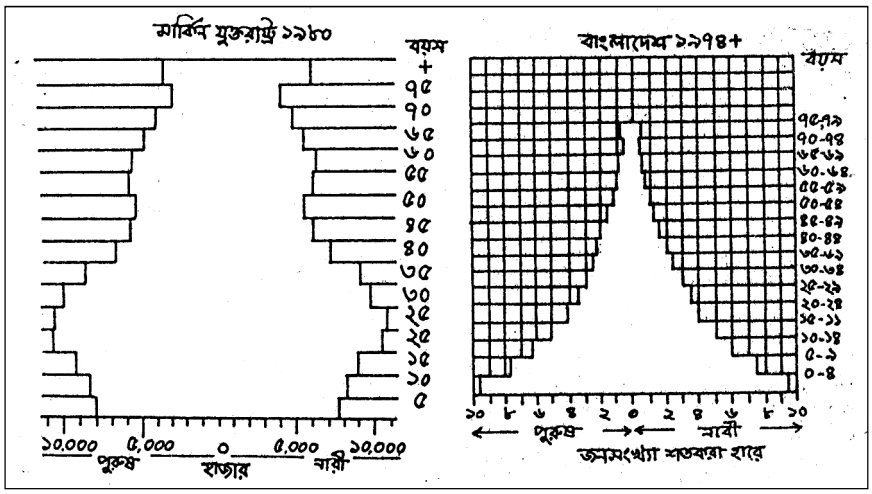

চিত্র ২২.৭-১ : জনসংখ্যা পিরামিড

জনসংখ্যা পিরামিড

আদমশুমারীর মাধ্যমে কোনো দেশের মোট জনসংখ্যা জানাটাই যথেষ্ট নয়। সে জনসংখ্যার মধ্যে কতজন নারী, কতজন পুরুষ, তাদের বয়স কত, একটি নির্দিষ্ট বয়ঃক্রমের মধ্যে কতজন পুরুষ, কতজন নারী তা জানাও অতীব জরুরি। জনসংখ্যার এ সমস্ত উপাত্তগুলি নিয়ে জনসংখ্যা কাঠামো গঠিত। এ কাঠামো থেকে জনসংখ্যা বৈশিষ্ট্য তথা জন্মহার, মৃত্যুহার, কর্মক্ষম জনসংখ্যা, নির্ভরশীল জনসংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। ১৫ বছর বয়সের কম এবং ৬৪ বছর বয়সের উর্ধ্বের জনসংখ্যাকে সাধারণত কর্মক্ষম নয় অর্থাৎ অন্যের উপর নির্ভরশীল হিসেবে ধরা হয়। কোনো দেশের নির্ভরশীল জনসংখ্যা ও কর্মক্ষম জনসংখ্যার অনুপাতকে নির্ভরশীলতার অনুপাত বলে। সুতরাং যে দেশে নির্ভরশীল জনসংখ্যার হার বেশি, সেদেশে নির্ভরশীলতার অনুপাত বেশি। নারীর ১৫ বছর বয়স থেকে ৪৯ বছর বয়স পর্যন্ত বয়সকে সন্তান ধারণে সক্ষম হিসেব ধরা হয়। যে দেশে সন্তান ধারণে সক্ষম বয়সের নারীর সংখ্যা বেশি, সে দেশে জন্মহার বেশি হতে বাধ্য। জনসংখ্যা কাঠামো থেকে জনসংখ্যার এসব বৈশিষ্ট্য জানা যায়। জনসংখ্যা কাঠামোকে চিত্রের সাহায্যে প্রদর্শন করার একটি পদ্ধতিকে জনসংখ্যা পিরামিড বলে। জনসংখ্যা পিরামিডের মাধ্যমে নারী পুরুষের সংখ্যা ও তাদের বয়স কাঠামোকে লেখচিত্রের সাহায্যে প্রদর্শন করা হয়। এ লেখচিত্র অংকন করতে সমস্ত জনসংখ্যাকে ৫ অথবা ১০ বছরের বয়সের ব্যবধানে বিভক্ত করা হয়, যেমন, ০-৪, ৫-৯, ১০-১৪ ইত্যাদি, অথবা ০-৯, ১০-১৯, ২০-২৯ ইত্যাদি। প্রতিটি বয়স কাঠামোতে নারী ও পুরুষের সংখ্যা আনভূমিক বার (Bar) দিয়ে দেখান হয়। সাধারণত কেন্দ্রের ডান পাশে নারী এবং বাম পাশে পুরুষ সংখ্যা দেখানো হয়ে থাকে। এর পর বারগুলো বয়ঃক্রম অনুযায়ী নিচ থেকে উপরের দিকে সাজানো হয়। বয়ঃক্রমকে সাধারণত বার এর কেন্দ্রবিন্দু বরাবর খাড়াভাবে দেখানো হয়। তবে বয়ঃক্রমকে বারের ডান পাশ বা বামপাশেও দেখান যেতে পারে।

চিত্রে বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা পিরামিড দেখান হয়েছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা পিরামিড দেখলে মনে হবে এটা অনেকটা মিশরের পিরামিডের মত। এজন্য এ লেখচিত্রকে পিরামিড বলে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা থেকে দেখা যায় যে, এদেশে ০-৪ বছর বয়সের জনসংখ্যা বেশি। আবার ৬৪ বছরের উর্ধ্বে

জনসংখ্যা খুবই কম, অর্থাৎ মৃত্যু হারও বেশি। বিংশ শতাব্দির আগে পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এরকম উচ্চ জন্মহার ও নিু মৃত্যুহার ছিল, যার ফলে প্রায় সব দেশের জনসংখ্যা পিরামিড একই রকম ছিল। কিন্তু বর্তমানে উন্নত দেশগুলিতে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই তুলনামূলকভাবে অনেক কমে গেছে। এর ফলে জনসংখ্যা পিরামিডের চেহারাতেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা পিরামিডটি লক্ষ করলে এসম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে। যুক্তরাষ্ট্রে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর সংখ্যা কম, যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমকে নির্দেশ করে। আবার ৬৪ বছর বয়সের লোকসংখ্যা বাংলাদেশের তুলনায় বেশি, অর্থাৎ সেখানে মৃত্যুহারও কম। এরকম কম জন্মহার এবং কম মৃত্যুহার যুক্ত জনসংখ্যা পৃথিবীর সকল দেশের কাম্য। যুক্তরাষ্ট্রের পিরামিডে আর একটা বিষয় দেখা যায় যে, ৬৪ বছর বয়সের উর্ধ্বে নারীর সংখ্যা পুরুষের সংখ্যার চেয়ে বেশি। এ ফলাফল এটা প্রমাণ করে যে, যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষ অপেক্ষা নারীরা বেশি দিন বাঁচে। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এর ঠিক উল্টা অবস্থা দেখা যায়, নারীদের চেয়ে পুরুষদের আয়ুষ্কাল বেশি।

জনসংখ্যা পিরামিড থেকে কোনো দেশের ১৫ বছরের কম বয়সের এবং ৬৪ বছরের বেশি বয়সের নারী পুরুষের সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব, যা থেকে নির্ভরশীলতার অনুপাত বের করা যায়। বাংলাদেশের জনসংখ্যা পিরামিড থেকে দেখা যায় মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশের বয়স ১৫ বছরের নিচে এবং ৫ শতাংশের বয়স ৬৪ বছরের উর্ধ্বে, এরা সবাই নির্ভরশীলদের অন্তর্ভুক্ত। অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ জনসংখ্যার বয়স ১৫-৬৪ বছর এর মধ্যে, এরা সবাই কর্মক্ষমের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং নির্ভরশীলতার অনুপাত হচ্ছে, ৫০ঃ৫০ বা ১ঃ১। অর্থাৎ প্রতি উপার্জনক্ষম ব্যক্তির উপর একজন নির্ভরশীল। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের পিরামিড পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় মোট জনসংখ্যার ২৩ শতাংশের বেশির বয়স ১৫ বছরের কম আবার ১১ শতাংশের বয়স ৬৪ বছরের বেশি। বাকী ৬৬ শতাংশ লোক কর্মক্ষম। কাজেই, যুক্তরাষ্ট্রে নির্ভরশীলতার অনুপাত ৩৪ঃ৬৬ বা ০.৫২ঃ১। এ অনুপাত বাংলাদেশের অনুপাতের প্রায় অর্ধেক। অর্থাৎ প্রতি দুজন উপার্জনক্ষম ব্যক্তির উপর একজন নির্ভরশীল।

সারসংক্ষেপ

- কোনো এলাকা বা দেশে কতজন লোক বাস করে তা জানার সহজ উপায় হল, সেখানে বসবাসকারী লোককে গণনা করা- আদমশুমারীর মাধ্যমে এটা করা হয়।
- আদমশুমারী ছাড়া নমুনা জরিপ পদ্ধতিতে কোনো এলাকার জনসংখ্যা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়।
- স্থুল জন্মহার ও স্থুল মৃত্যুহার এর পার্থক্যকে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি হার বলা হয়।
- জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি হারের সাথে দেশান্তর যোগ বা বিয়োগ করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার নির্ণয় করা হয়।
- কোনো কোনো এলাকা বা দেশে দেশান্তর হার শূন্য হলে এবং কোনো নির্দিষ্ট বছরে জন্মসংখ্যা ও মৃত্যুসংখ্যা সমান হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না। একে বলা হয় জনসংখ্যা শূন্য হার।
- জনসংখ্যা পিরামিডের সাহায্যে নারী পুরুষের সংখ্যা ও তাদের বয়স কাঠামোকে লেখচিত্রের সাহায্যে প্রদর্শন করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আমাদের দেশে কত বছর পর পর আদমশুমারী করা হয়?
ক. ১০ বছর খ. ১৫ বছর গ. ২০ বছর ঘ. ৫ বছর

২. সর্বশেষ আদমশুমারী হয় কত সালে?
ক. ১৯৮৫ সালে খ. ১৯৮১ সালে গ. ১৯৯১ সালে ঘ. ১৯৮৯ সালে

৩. বাংলাদেশে প্রতি দম্পত্তির জন্য কয়টি সন্তান নেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে?
ক. তিনটি খ. দুইটি গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

৪. বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার কত শতাংশের বয়স ১৫ বছরের নিচে?
ক. ৪০ শতাংশ খ. ৩০ শতাংশ গ. ৩৫ শতাংশ ঘ. ৪৫ শতাংশ

৫. যুক্তরাষ্ট্রে নির্ভরশীলতার অনুপাত কত?
ক. ১ঃ১ খ. ০.৫২ঃ১ গ. ১ঃ০.৫২ ঘ. ১ঃ৩।

পাঠ ২২.৮

জনমিতির অবস্থান্তর ও জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জনমিতির অবস্থান্তর কি বলতে পারবেন;
- জনমিতির অবস্থান্তরের ব্যাখ্যা দিতে পারবেন;
- জনসংখ্যা সমস্যার সমাধানে করণীয় পদক্ষেপগুলি উল্লেখ করতে পারবেন।

জনমিতির অবস্থান্তর

বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধি এক প্রলয়ের সৃষ্টি হয়েছে। জনসংখ্যার এ বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি তথা পরিবর্তন সকল সময়ে এবং সকল দেশে একরকম নয়। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত এ হার ছিল অত্যন্ত কম। কিন্তু তারপর থেকে তা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিচের সারণী ২২.৮-১ থেকে দেখা যায় ১৬৫০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৫০ কোটি যা ১৮৫০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয় অর্থাৎ জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লাগে ২০০ বছর। এরপর কিন্তু জনসংখ্যা দ্বিগুণ তথা ২০০ কোটিতে পৌঁছাতে সময় লেগেছে ৮০ বছর, পরে এ সংখ্যা ৪০০ কোটিতে পৌঁছাতে সময় লেগেছে মাত্র ৪৫ বছর। বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় ৬০০ কোটি। বাংলাদেশের অবস্থা আরও সংকটাপন্ন, ১৮৯১ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৪ গুণ অর্থাৎ ২.৬৫ কোটি থেকে ১১.১৪ কোটিতে। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি।

সারণী : পৃথিবীর জনসংখ্যা

সাল	জনসংখ্যা কোটিতে	মন্তব্য
১৬৫০	৫০	
১৮৫০	১০০	জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছে ২০০ বছর
১৯৩০	২০০	জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছে ৮০ বছর
১৯৬০	৩০০	
১৯৭৫	৪০০	জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছে ৪৫ বছর
১৯৮৬	৫০০	

জনসংখ্যার এ পরিবর্তন একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যে প্রক্রিয়ায় জনসংখ্যার পরিবর্তন সম্পন্ন হয় তাকে বলে জনমিতি অবস্থান্তর (Demographic transition)। জনমিতি অবস্থান্তরকে সাধাণত তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। প্রথম স্তরে জন্মহার এবং মৃত্যুহার উভয়ই বেশি। দ্বিতীয় স্তরে শুরুতে মৃত্যুহার কমে কিন্তু সে অনুপাতে জন্মহার কমে না। এজন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক হার অনেক বেড়ে যায়। এ স্তরের শেষের দিকে মৃত্যুহার প্রায় অপরিবর্তিত থাকে তবে জন্মহারও কমতে থাকে। তৃতীয় স্তরে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই কমে প্রায় সমান হয়ে যায়। ফলে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি হারও হ্রাস পায়।

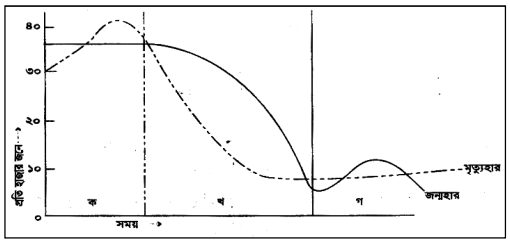

চিত্র ২২.৮-১ : জনমিতিক অবস্থান্তর

এখানে চিত্রের সাহায্যে বর্তমানে উন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে জনমিতিক অবস্থান্তরের স্তরগুলো দেখানো হয়েছে।

প্রথম স্তরে বা 'ক' অংশে জনসংখ্যার জন্ম ও মৃত্যু উভয় হারই বেশি হওয়ায় জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি হার কম থাকে। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে না। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় সকল দেশে এ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। দ্বিতীয় স্তরে বা 'খ' অংশের প্রথাম ভাগে মৃত্যুহার দ্রুত বৃদ্ধি পায় কিন্তু জন্মহার প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। ফলে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি হার হঠাৎ বৃদ্ধি পায় এবং দেশের জনসংখ্যা দ্রুত হারে বেড়ে যায়। একে জনসংখ্যার বিস্ফোরণও বলা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে চিকিৎসা শাস্ত্র ও কৃষি গবেষণার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে, যার ফলে লোকের মৃত্যুহার পর্যায়ক্রমে কমতে থাকে। পূর্বে কলেরা, টাইফয়েড, বসন্ত, টিটেনাস, প্লেগ, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে প্রচুর লোকের মৃত্যু ঘটত, কিন্তু বর্তমানে এ সমস্ত রোগের যথাযত টীকা আবিষ্কৃত হওয়ায় মানুষের মৃত্যুহার কমে গেছে অর্থাৎ মানুষের আয়ষ্কাল বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ে দেশে শিল্পের উন্নয়ন ঘটে, কৃষি উন্নতি লাভ করে নগরায়ন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে ক্রমান্বয়ে মৃত্যুহার হ্রাস পাওয়ায় পরিবারে শিশু জন্মদানের প্রবণতা কমে যায়। এজন্য আস্তে আস্তে জন্মহারও কমতে থাকে। এ স্তরের শেষ অংশে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই কমে যায়।

তৃতীয় স্তর বা 'গ' অংশ হচ্ছে সর্বশেষ স্তর। এ স্তরে জন্মহার ও মৃত্যুহার কমে গিয়ে একটি স্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারও হ্রাস পায়; এমনকি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্য হয়। ইউরোপ, আমেরিকার অনেক উন্নত দেশে বর্তমানে এ অবস্থা বিরাজ করছে। এ স্তরে মানুষের জীবযাত্রার মান উন্নত হয়। মানুষ সুস্থ ও সবল থাকে এবং তাদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায়।

চিত্রের দ্বিতীয় স্তর বা 'খ' অংশকে জনমিতি অবস্থান্তর স্তর বলা হয়। প্রথম স্তরকে ('ক' অংশ) প্রাক অবস্থান্তর এবং তৃতীয় স্তর ('গ' অংশ) কে উত্তর অবস্থান্তর বলা হয়। বর্তমানে জাপান ছাড়া এশিয়ার দেশগুলো জনমিতিক অবস্থান্তর স্তরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করছে। বাংলাদেশের অবস্থান এ স্তরের শেষভাগে।

জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ জন্মহার বৃদ্ধি এবং মৃত্যুহার হ্রাস। এছাড়া দেশান্তর হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বহির্গমনের সংখ্যা বহিরাগমন সংখ্যার তুলনায় বেশি হওয়ায় দেশান্তর হার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। অপরদিকে বাংলাদেশে মৃত্যুহার উন্নত দেশগুলোর তুলনায় বেশি। কাজেই দেখা যাচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান নিয়ামক জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা সমাধান দু'ভাবে করা যেতে পারে- প্রথমত জন্মহার কমিয়ে এবং দ্বিতীয়ত মৃত্যুহার বাড়িয়ে। কিন্তু মৃত্যু কারো কাম্য নয় বরং মানুষ দিন দিন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিভাবে আরও বেশিদিন এ সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকা যায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য উন্নতির সাথে সাথে চিকিৎসা শাস্ত্রে উন্নতি ঘটছে। এর পাশাপাশি মানুষ নিত্য নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার করে বিশ্বব্যাপী বিপুল জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর বিজ্ঞানীদের এসব প্রচেষ্টার ফলে মানুষের আয়ুষ্কাল ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের প্রধান উপায় হল জন্মহার কমানো। এছাড়া উন্নত দেশগুলোতে বহিরাগমন সংখ্যা বেশি হওয়ায়, এটা জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, এজন্য সেসমস্ত দেশে বহিরাগমন নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

কোনো দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে গৃহিত পদক্ষেপ গুলোর কার্যকারিতা নির্ভর করে সে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার উপর। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হবে। উন্নত দেশের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব উন্নয়ণশীল দেশের ক্ষেত্রে সে পদ্ধতি কার্যকর নাও হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের কথা, সেখানে শিক্ষিতের হার অনেক বেশি। সুতরাং পরিবারের সদস্য সংখ্যা সীমিত রাখা বা জন্মহার কমানোর বিষয়ে জনসাধারণ নিজেরাই সচেতন এবং উদ্যোগী। এ কারণে শুধু জন্ম নিয়ন্ত্রণের আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং তা জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে বহিরাগমনের সংখ্যা অধিক বলে তা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

উন্নয়নশীল দেশ যেমন- বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত-এদের সমস্যা ভিন্ন। যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত পদ্ধতি এ সমস্ত

দেশে অকার্যকর। এ সমস্ত দেশের অধিকাংশ জনগণ অশিক্ষিত, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এ জন্য এসব দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করে জনসংখ্যা সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে এর নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। অধিক সংখ্যক সন্তান হওয়া থেকে বিরত রাখার লক্ষে বাংলাদেশে ইতোমধ্যে ১৮ বছরের কম বয়সের মেয়েদের এবং ২১ বছরের কম বয়সের ছেলেদের বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে জন্মহার ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু অশিক্ষিত ও নিরক্ষর জনগণের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি তেমন প্রসার লাভ করেনি। এ জন্য এদেশে জন্মনিয়ন্ত্রণকে সফল করতে হলে জনগণকে সুশিক্ষিত করে তুলতে হবে। সরকার অবশ্য এ ব্যাপারে কিছুটা উদ্দোগী হয়েছেন। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে আইন করে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নারী শিক্ষার প্রসার লাভের জন্য একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বেতন মাফ করা হয়েছে।

বিশ্বের জনবহুল দেশগুলোর মধ্যে চীন অন্যতম। বর্তমানে চীনের জনসংখ্যা প্রায় ১৪০ কোটি। কিন্তু চীন জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। চীনের লক্ষ্যমাত্রা দম্পতি প্রতি একটি সন্তান।

একটি সন্তানযুক্ত দম্পতিদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তারা কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। নিচে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে চীনে ব্যবহৃত পদক্ষেপগুলি নিম্নরূপ-

- একটি সন্তান থাকলে তার ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত মাসিক ভাতা প্রদান করা হবে।
- বাসস্থান বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
- সন্তানকে স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।
- সন্তান চাকুরীর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।
- অবসর গ্রহণের পর দম্পতিকে অধিক হারে পেনশন প্রদান করা হবে।
- গ্রামাঞ্চলে এক সন্তান বিশিষ্ট দম্পতি, সন্তানের ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা পাবে।
- এক সন্তান পরিবারকে দু'সন্তান পরিবারের সমান রেশন প্রদান করা হবে।
- চাষাবাদের জন্য সকল গ্রামীণ পরিবারকে সমান পরিমাণ জমি প্রদান করা হবে- যা পরোক্ষভাবে এক সন্তান পরিবারকে উৎসাহিত করাই উদ্দেশ্য।

এছাড়া অধিক সন্তানকে নিরুৎসাহিত করার জন্যে দুসন্তানের পর প্রতি সন্তানের জন্য করের হার বৃদ্ধি, সন্তান হওয়ার ডাক্তারী খরচ এবং পড়ালেখার খরচ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনায় এটাই বুঝা যায় যে, জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা জরুরি।

- জনগণকে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।
- অধিক সংখ্যক জনসংখ্যার কুফল এবং স্বল্প সংখ্যক জনসংখ্যার সুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা।
- জন্মনিয়ন্ত্রণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এক বা দুসন্তানের পরিবারকে আর্থিক বা অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা।
- অধিক সন্তান হওয়া নিরুৎসাহিত করার জন্য দুসন্তানের অধিক পরিবারকে জরিমানা বা অন্য শাস্তির বিধান রাখা।
- উপরোক্ত পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইন পাশ করা।

সারসংক্ষেপ

- যে প্রক্রিয়ায় জনসংখ্যার পরিবর্তন সম্পন্ন হয় তাকে বলে জনমিতিক অবস্থান্তর।
- জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ জনমিতিক অবস্থান্তর স্তরে শেষ ভাগে অবস্থান করছে।
- জনিমিতিক অবস্থান্তরকে সাধারণত তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হয়ে থাকে।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা সমাধানের প্রধান উপায় হচ্ছে জন্মহার হ্রাস করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ১৯৭৫ সালে বিশ্বে মোট জনসংখ্যা কত ছিল?
ক. ২০০ কোটি খ. ৩০০ কোটি গ. ৪০০ কোটি ঘ. ৫০০ কোটি

২. ১৯৩০ সালের পর কত বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়?
ক. ৪৫ বছরে খ. ২০০ বছরে গ. ১০০ বছরে ঘ. ৮৫ বছরে

৩. বাংলাদেশে ১৮৯১ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কত গুণ?
ক. দুই গুণ খ. চার গুণ গ. তিনগুণ ঘ. পাঁচ গুণ

৪. জনমিতিক অবস্থান্তরকে কয়টি স্তরে ভাগ করা হয়?
ক. দুইটি খ. পাঁচটি গ. চারটি ঘ. তিনটি

৫. বাংলাদেশের অবস্থান জনমিতিক অবস্থান্তরের কোন পর্যায়ে?
ক. প্রথম পর্যায়ে খ. দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষভাগে গ. তৃতীয় পর্যায়ে ঘ. দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথমভাগে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি

১. বায়ু, পানি ও গাছপালার সাথে জনগণের সম্পর্ক বর্ণনা করুন।
২. বায়ু, পানি ও গাছপালার উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবসমূহ উল্লেখ করুনএবং এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা আলোচনা করুন।
৩. প্রাকৃতিক চক্র কয়টি ও কি কি উল্লেখ করুন।
৪. নাইট্রোজেন চক্র বর্ণনা করুন। এর উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব আলোচনা করুন।
৫. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রকৃতিতে পানির ভারসাম্য কিভাবে নষ্ট হয়? পরিবেশের উপর এর প্রভাব লিখুন।
৬. বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির কারণগুলো লিখুন।
৭. গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করুন।
৮. গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে করণীয় পদক্ষেপগুলি উল্লেখ করুন।
৯. পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন।
১০. পরিবেশ সংরক্ষণে করণীয় পদক্ষেপগুলি আলোচনা করুন।
১১. এইডস রোগের কারণগুলো লিখুন।
১২. এইডস রোগের লক্ষণ উল্লেখসহ এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা বর্ণনা করুন।
১৩. জনসংখ্যা তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করুন।
১৪. জনসংখ্যার শূন্য বৃদ্ধি হার ব্যাখ্যা করুন।
১৫. আপনি যে এলাকায় বাস করেন সে এলাকার জনসংখ্যা তথ্য সংগ্রহ করে তাকে ০-৪, ৫-৯, ১০-১৪, ১৫-১৯ ... ... ৬০-৬৪, ৬৪ এর উর্ধ্বে বয়সভিত্তিক শ্রেণীতে বিভক্ত করে একটি ছকের সাহায্যে দেখান।
১৬. জনসংখ্যা পিরামিড অঙ্কনের পদ্ধতি বর্ণনা করুন?
১৭. জনসংখ্যা পিরামিড থেকে জনসংখ্যা সম্পর্কে কি কি বৈশিষ্ট্য জানা যায় উল্লেখ করুন।

১৮. জনমিতিক অবস্থান্তর কাকে বলে? চিত্রের সাহায্যে জনমিতিক অবস্থান্তর ব্যাখ্যা করুন।
১৯. জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে করণীয় পদক্ষেপগুলি উল্লেখ করুন।
২০. টীকা লিখুন : ক. কার্বনচক্র খ. পানি চক্র গ. এইডস ঘ. গ্রীন হাউস গ্যাস ঙ. জনসংখ্যা পিরামিড।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১	:	১. গ	২. খ	৩. খ	৪. ঘ	৫. খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২	:	১. খ	২. ক	৩. ঘ	৪. গ	৫. গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩	:	১. গ	২. ক	৩. খ	৪. গ	৫. খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪	:	১. গ	২. ঘ	৩. ক	৪. খ	৫. গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫	:	১. ক	২. ক	৩. গ	৪. ঘ	৫. ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬	:	১. খ	২. ঘ	৩. ক	৪. গ	৫. খ	৬. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭	:	১. ক	২. গ	৩. খ	৪. ঘ	৫. খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮	:	১. গ	২. ক	৩. খ	৪. ঘ	৫. খ।	

সাধারণ বিজ্ঞান (রচনামূলক)

বিষয় কোড : SSC-1604, এসএসসি-২০ , সময় : ২ ঘণ্টা, পূর্ণমান : ৫০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রত্যেক বিভাগ হতে দুইটি করে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক বিভাগ

১। ক) বহুরূপতার সংজ্ঞা দিন। একটি বহুরূপী মৌল ও এর রূপান্তরভেদগুলির নাম লিখুন।হীরক ও গ্রাফাইটের মধ্যে পার্থক্য লিখুন? ১+১+৩=৫

খ) শব্দের প্রতিধ্বনি বলতে কি বুঝেন লিখুন। সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়ে শব্দের প্রতিধ্বনি ব্যবহার বর্ণনা করুন। ১+৪=৫

গ) ফিউজ কি? ফিউজ কেন ব্যবহার করা হয়? এর গঠন ও কার্যাবলি উল্লেখ করুন। ১+১+৩=৫

ঘ) ফ্যাক্স ও ইলেকট্রনিক্স মেইলের সংজ্ঞা লিখুন। এদের কার্যাপ্রণালী বর্ণনা করুন। ২+৩=৫

খ বিভাগ

২। ক) তন্তু বলতে কি বুঝ? তন্তু কত প্রকার ও কি কি? উদ্ভিজ তন্তু সম্পর্কে লিখুন। ১+১+৩=৫

খ) প্রসাধনী কি? প্রসাধনী কত প্রকার ও কি কি লিখুন। প্রসাধনীর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন। ১+২+২=৫

গ) পেইন্টের সংজ্ঞা দিন। পেইন্টের উপাদানগুলোর নাম লিখুন। ইমালশন পেইন্ট সম্পর্কে বর্ণনা করুন। ১+১+৩=৫

ঘ) কংক্রিটের সংজ্ঞা লিখুন। কংক্রিটের কাঁচামাল কি কি? কংক্রিট তৈরি প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন। ১+২+২=৫

গ বিভাগ

৩। ক) প্লাস্টিড কি? প্লাস্টিড কত প্রকার ও কি কি লিখুন। প্রত্যেক প্রকার প্লাস্টিডের বর্ণনা দিন। ১+১+৩=৫

খ) ভাইরাসের সংজ্ঞা দিন। ভাইরাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করুন। ১+৪=৫

গ) পরাগায়নের সংজ্ঞা লিখুন। পরাগায়ন কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার পরাগায়নের বর্ণনা দিন। ১+১+৩=৫

ঘ) সালোকসংশ্লেষণ কাকে বলে? সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন। ১+৪=৫

ঘ বিভাগ

৪। ক) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির সংজ্ঞা দিন। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর নাম লিখুন। থাইরয়েড গ্রন্থি ও এর কাজ সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১+১+৩=৫

খ) ম্যালেরিয়া কিভাবে মানুষের শরীরে ছড়ায় লিখুন। ম্যালেশিয়া নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বর্ণনা করুন। ৩+২=৫

গ) মেরুদন্ডের গঠন ও কাজ আলোচনা করুন। ৫

ঘ) স্নায়ুকোষ কি? স্নায়ুকোষের গঠন ও কাজ আলোচনা করুন। ১+২+২=৫

ঙ বিভাগ

৫। ক) শর্করার সংজ্ঞা দিন। রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী শর্করা কত প্রকার ও কি কি? শর্করার কাজও এর অভাবজনিত রোগ সম্পর্কে লিখুন। ১+১+৩=৫

খ) খাদ্য শৃঙ্খলের সংজ্ঞা দিন। বিভিন্ন প্রকার খাদ্য শৃঙ্খলগুলি আলোচনা করুন। ২+৩=৫

গ) নাইট্রোজেন চক্রের বর্ণনা দিন। পরিবেশ সংরক্ষণে করণীয় পদক্ষেপগুলি আলোচনা করুন। ৩+২=৫

ঘ) এইডস কি? এইডস রোগের কারণ ও লক্ষণসমূহ উল্লেখ করুন। এইডস থেকে মুক্তির উপায়গুলো লিখুন। ১+৩+১=৫

সাধারণ বিজ্ঞান (রচনামূলক)

বিষয় কোড : SSC-1604, এসএসসি-২০ , সময় : ২.০০ ঘন্টা, পূর্ণমান : ৫০

[দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান ৫ (পাঁচ)। প্রত্যেক বিভাগ হতে দুইটি করে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক বিভাগ

১। ক) মরিচার সংজ্ঞা দিন। কিভাবে মরিচার সৃষ্টি হয়? মরিচা প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

খ) বায়োগ্যাস কি লিখুন। একটি স্থির ডোম বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

গ) শব্দের বেগ বলতে কি বুঝেন লিখুন। সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়ে শব্দের প্রতিধ্বনির ব্যবহার বর্ণনা করুন।

ঘ) ফ্যাক্স ও ইলেকট্রনিক মেইল কি লিখুন। এদের কার্যপ্রণালী বর্ণনা করুন।

খ বিভাগ

২। ক) রং কি উল্লেখ করুন। রং কতপ্রকার ও কি কি লিখুন। বস্ত্রে রং প্রয়োগ প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

খ) তন্তু কত প্রকার ও কি কি লিখুন। বিভিন্ন প্রকার তন্তুর বর্ণনা দিন।

গ) সিমেন্টের সংজ্ঞা দিন। কংক্রিট ও ব্লক তৈরি প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

ঘ) পেইন্ট কি লিখুন। পেইন্টের উপাদানগুলোর নাম লিখুন। ইমালশন পেইন্ট সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

গ বিভাগ

৩। ক) টিস্যুর সংজ্ঞা দিন। টিস্যু কত প্রকার ও কি কি লিখুন। স্থায়ী টিস্যু সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

খ) ভাইরাসের সংজ্ঞা দিন। ভাইরাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

গ) শ্বসনের সংজ্ঞা লিখুন। সবাত শ্বসন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

ঘ) পরাগায়ন কাকে বলে লিখুন। পরাগায়ন কত প্রকার ও কি কি উল্লেখ করুন। উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার পরাগায়নের বর্ণনা দিন।

ঘ বিভাগ

৪। ক) ম্যালেরিয়া কিভাবে মানুষের শরীরে ছড়ায় লিখুন। ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

খ) চিত্রসহ খাদ্য পরিপাক প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

গ) কঙ্কালতন্ত্র কাকে বলে লিখুন। মানুষের কঙ্কালতন্ত্রের চিহ্নিত চিত্র আঁকুন।

ঘ) স্নায়ুতন্ত্রের সংজ্ঞা দিন। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের গঠন বর্ণনা করুন।

ঙ বিভাগ

৫। ক) খাদ্য-শৃংখলের সংজ্ঞা লিখুন। উদাহরণসহ খাদ্য-শৃংখলের বর্ণনা করুন।

খ) নাইট্রোজেন চক্রের বর্ণনা দিন। নাইট্রোজেন চক্রের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব আলোচনা করুন।

গ) খাদ্যজাল কি লিখুন। চিত্রসহ খাদ্যজালের বর্ণনা দিন।

ঘ) এইডস কি লিখুন। এইডস রোগের কারণ ও লক্ষণসমূহ উল্লেখ করুন। এইডস থেকে মুক্তির উপায়গুলো লিখুন।

সাধারণ বিজ্ঞান (নৈর্ব্যক্তিক)

বিষয় কোড : SSC-1604, এসএসসি-২০০৯, সময় : ৫০ মিনিট, পূর্ণমান : ৫০
[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান-১]

ক বিভাগ

১। এক কথায় উত্তর দিন!
ক) জিপসামের রাসায়নিক সংকেত লিখুন। খ) পাউডারে কোন উপাদানটি সর্বাধিক পরিমাণে থাকে?
গ) বায়ো অর্থ কি? ঘ) ডেটলের প্রধান উপাদান কি?
ঙ) শব্দ সঞ্চালিত হওয়ার জন্য কিসের প্রয়োজন হয়? চ) হাইড্রা কোন পর্বভুক্ত প্রাণি?
ছ) মানবদেহের প্রতিটি কোষে ক্রোমোজম সংখ্যা কত? জ) শব্দানুভূতির স্থায়ীত্বকাল কত?
ঝ) সবাত শ্বসনে ক্রেবস্ চক্রটি কোথায় সংঘটিত হয়? ঞ) দূষিত রক্ত কোথায় বিশুদ্ধ হয়?

২। সঠিক উত্তরটি লিখুন:
ক) বায়োগ্যাসে মিথেন গ্যাস শতকরা কত ভাগ?
● ৬০-৭০ ভাগ ● ৬৫-৭০ ভাগ ● ৫০-৬০ ভাগ ● ৫৫-৬০ ভাগ।
খ) শৈবাল কোন ধরনের উদ্ভিদ?
● পরভোজী ● স্বভোজী ● মিথজীবী ● পরজীবী।
গ) নিচের কোনটি ফার্ণজাতীয় উদ্ভিদ?
● ব্রায়াম ● সিলাজিনেলা ● রিকসিয়া ● মারকেনসিয়া।
ঘ) গ্রীন হাউজ কি?
● সবুজ পাকা ঘর ● সবুজ কাঁচা ঘর ● কাঁচ নির্মিত ঘর ● কাঠ নির্মিত ঘর।
ঙ) নিচের কোনটি বহুরূপী মৌল?
● লৌহ ● গন্ধক ● সোডিয়াম ● অ্যালুমিনিয়াম।
চ) ব্যাকটেরিয়া শব্দের অর্থ কি?
● গোলাকৃতি ● প্যাঁচানো আকৃতি ● দন্ড ● কমা আকৃতি।
ছ) নালীবিহীন গ্রন্থি থেকে কি নিঃসৃত হয়?
● HCl ● পিওরস ● হরমোন ● অগ্ন্যাশয় রস।
জ) ইস্পাতে কার্বনের পরিমাণ কত?
● ১.৫-২.৫%, ● ০.১২-০.২০%, ● ০.২৫-১.৫%, ● ২.০-২.৫%।
ঝ) ক্ষুদ্রান্ত কয়টি অংশে বিভক্ত?
● দুইটি, ● তিনটি, ● চারটি, ● পাঁচটি।
ঞ) প্রতিসেকেন্ডে বস্তুর কম্পন সংখ্যা কত হলে আমরা শব্দ শুনতে পাই?
● ২০ হতে ২০,০০০ এর মধ্যে, ● ২০,০০০ এর অধিক হলে, ● ২০ এর কম হলে, ● ২০-২০,০০০ এর বাহিরে হলে।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন:-
ক) ভূ-ত্বকের গভীর থেকে যা তোলা হয় তাহাই ..... । খ) ক্যান্সার নিরাময়ে ..... ব্যবহার করা হয়।
গ) জীবদেহের গঠন ও কাজের একক হলো ..... । ঘ) দুধ ..... প্রোটিন।
ঙ) মাইটোকন্ড্রিয়ায় প্রায় ..... প্রোটিন থাকে। চ) বাস্তুসংস্থানের জড় উপাদান ..... ধরনের।
ছ) ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী ভাইরাসকে ..... বলে। জ) এক ইউনিট বিদ্যুৎ ..... কিলোওয়াট ঘন্টার সমান।
ঝ) বৃক্কের গঠন ও কার্যকরী একক হলো ..... । ঞ) উদ্ভিদদের দৃঢ়তা প্রদানকারী টিস্যুর নাম..... ।

৪। সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুন:-
ক) আইনষ্টাইন আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। খ) পিতল একটি সংকর ধাতু।
গ) সূর্য থেকে চেইন বিক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তি উৎপন্ন হয়। ঘ) রেফ্রিজারেটরে নিয়ন গ্যাস ব্যবহার করা হয়।
ঙ) রেশম প্রথম উৎপাদিত কৃত্রিম তন্তু। চ) চর্বি সাবান তৈরির মূল উপাদান।
ছ) স্যাভলন জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জ) প্রতিফলনই শব্দের প্রতিধ্বনির কারণ।
ঝ) ভাইরাস এক ধরনের অকোষীয় উদ্ভিদ। ঞ) অ্যামিবা পরিফেরা পর্বের প্রাণি।

৫। বামপাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করুণ :-
ক) মাইটোকন্ড্রিয়াকে বলা হয় অ) গ্রন্থিরাজ
খ) সেভিং সাবানে ব্যবহৃত হয় আ) ৮-১০ মিটার
গ) পোস্টিক নালীর দৈর্ঘ্য ই) কোয়াশিয়রকর
ঘ) পিটুইটারী গ্রন্থিকে বলা হয় ঈ) শক্তিধর
ঙ) পেইন্টের মাধ্যমে উপাদানটি হল উ) সাইকাস
চ) প্রোটিনের অভাবজনিত রোগ ঊ) স্টিয়ারিক এসিড
ছ) নগ্নজীবী উদ্ভিদ ঋ) ১২০ দিন
জ) পাতার সাহায্যে বংশবৃদ্ধি করে এ) তরল
ঝ) খাদ্যের মোট উপাদান ঐ) পাথরকুচি
ঞ) লোহিত রক্ত কণিকার আয়ুষ্কাল ও) ৬টি।

সাধারণ বিজ্ঞান (নৈব্যক্তিক)

বিষয় কোড : SSC-1604, এসএসসি-২০০৯, সময় : ৫০ মিনিট, পূর্ণমান : ৫০
[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রত্যেক বিভাগ হতে দুইটি করে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক বিভাগ

১। ক) সংকেত ধাতুর সংজ্ঞা দিন। সংকর ধাতুর গুরুত্ব আলোচনা করুন। ১+৪=৫
খ) চল বিদুৎ কত প্রকার ও কি কি? অ্যাম্পিয়ার, ভোল্ট, ওহম ও ওয়াট সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১+৪=৫
গ) জীবাশ্ম জ্বালানী কাকে বলে? জীবাশ্ম জ্বালানি কিরূপে সৃষ্টি হয়েছে? এটি নবায়নযোগ্য নয় কেন? ১+৩+১=৫
ঘ) বিদ্যুৎ কোষ কাকে বলে? একটি ড্রাইসেলের নির্মাণ কৌশল বর্ণনা করুন। ১+৪=৫

খ বিভাগ

২। ক) এন্টিসেপটিক সামগ্রী কাকে বলে? এর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন। একটি এন্টিসেপটিক সামগ্রির বর্ণনা দিন। ১+২+২=৫
খ) সাবান বলতে কি বোঝেন? সাবান কত প্রকার ও কি কি? সাবান ও ডিটারজেন্টের তুলনামূলক আলোচনা করুন। ১+১+৩=৫
গ) ভার্নিশের সংজ্ঞা দিন। ভার্নিশের কত প্রকার ও কি কি? বিভিন্ন প্রকার ভার্নিশ প্রস্তুতের প্রক্রিয়া ও ব্যবহার উল্লেখ করুন। ১+১+৩=৫
ঘ) জিপসাম কাকে বলে? এর প্রস্তুতপ্রণালী লিখুন। জিপসাম দ্বারা কি কি প্লাস্টার প্রস্তুত করা হয়? এদের ব্যবহার লিখুন। ১+১+৩=৫

গ বিভাগ

৩। ক) কোষ কাকে বলে একটি আদর্শ উদ্ভিদ কোষের চিহ্নিত চিত্র আঁকুন। ১+৪=৫
খ) নিউক্লিয়াস কি? একে কোষের প্রাণকেন্দ্র বলা হয় কেন? চিত্রসহ নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দিন। ১+১+৩=৫
গ) ব্যকটেরিয়ার সংজ্ঞা দিন। ব্যাকটেরিয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করুন। ১+৪=৫
ঘ) উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান বলতে কি বোঝেন? অত্যাবশ্যকীয়পুষ্টি উপাদানগুলোর নাম লিখুন। নাইট্রোজেনের কাজ ও অভাবজনিত লক্ষণ আলোচনা করুন। ১+২+২=৫

ঘ বিভাগ

৪। ক) শ্রেণীবিন্যাসের সংজ্ঞা দিন। প্রাণিজগতের প্রধান পর্বতগুলোর নাম উল্লেখসহ একটি করে উদাহরণ দিন। ১+৪=৫
খ) রক্ত কি? রক্তের উপাদানগুলো কি কি? রক্তের কাজ সম্পর্কে লিখুন। ১+১+৩=৫
গ) শ্বসন কাকে বলে? শ্বসনতন্ত্রের গঠনপ্রণালী বর্ণনা করুন। ১+৪=৫
ঘ) চিত্রসহ চোখের গঠন বর্ণনা করুন। ৫

ঙ বিভাগ

৫। ক) প্রোটিন কি? প্রোটিনের উৎস, কাজ এবং এর অভাবজনিত রোগ সম্পর্কে লিখুন। ১+১+২+১=৫
খ) ভিটামিন কি? ভিটামিন কত প্রকার ও কি কি? ভিটামিন 'ই' এর উৎস কাজ ও এর অভাবজনিত রোগ ও লক্ষণগুলো লিখুন। ১+১+৩=৫

গ) বাস্তুসংস্থান কাকে বলে? একটি পুকুরের বাস্তুসংস্থান বর্ণনা করুন। ১+৪=৫
ঘ) গ্রীণ হাউজ কি? গ্রীণ হাউজ গ্যাসগুলোর নাম লিখুন। গ্রীণ হাউজ প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করণীয় পদক্ষেপগুলো উল্লেখ করুন। ১+১+৩=৫

সাধারণ বিজ্ঞান (নৈব্যক্তিক)

বিষয় কোড : SSC-1604, এসএসসি-২০০৯, সময় : ৫০ মিনিট, পূর্ণমান : ৫০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১। এক কথায় উত্তর দিন।
ক) হিরক ও গ্রাফাইটেরমূল উপাদানের নাম কি?
খ) রেফ্রিজারেটরে কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয়?
গ) স্পিনিং বলতে কি বোঝায়?
ঘ) সিল্ক কাপড়কে কাঁচ দ্বারা ঘষলে কাঁচে কোন ধরনের চার্জ উৎপন্ন হয়?
ঙ) সাবান তৈরির মূল উপাদানের নাম কি?
চ) টিটেনিয়াম ডাই অক্সাইড কোন বর্ণের পিগমেন্ট?
ছ) উদ্ভিদ ভাইরাসের সাধারণত কোন ধরনের নিউক্লিক এসিড থাকে?
জ) ইউরিয়াতে শতকরা কতভাগ নাইট্রোজেন থাকে।
ঝ) অ্যামিবা কোন পর্বের প্রাণি?
ঞ) প্রাণিজগতের পর্বের সংখ্যা কতটি?

২। সঠিক উত্তরটি লিখুন:-
ক) ক্যান্সার নিরাময়ে কি ব্যবহার করা হয়?
● রঞ্জন রশ্মি ● রেডিয়াম
● পেনিসিলিন ● স্ট্রেপটোমাইসিন
খ) কত কিলোগ্রামের এক মেট্রিক টন?
● ১০০ ● ১০০০
● ১০ ● ১০০০০।
গ) খনিতে মৌল হিসেবে পাওয়া যায় কোনটি?
● লোহা ● তামা
● হীরা ● সীসা।
ঘ) আইনস্টাইন প্রদত্ত ভর ও শক্তি সম্পর্কিত সূত্র কোনটি?
● $E=mc^2$ ● $E=m^2c^2$
● $E=mc$ ● $E=m^2c$·
ঙ) জীবাশ্ম জ্বালানি বলতে কোনটাকে বোঝায়?
● পাঠখড়ি ● ফরমিকা
● কাঠ ● কয়লা।
চ) বিদ্যুৎ ক্ষমতার একক কি?
● ভোল্ট ● ওহম
● অ্যাম্পিয়ার ● ওয়াট।
ছ) লিনেন কি?
● বীজ ● বৃক্ষ কোষ
● প্রাণিজ তন্তু ● খনিজ তন্তু।
জ) বস্ত্রে ছাপ দিয়ে রং লাগানোকে কি বলে?
● স্পিনিং ● ডায়িং
● প্রিন্টিং ● কম্বিং।
ঝ) টুথ পাউডারে কোন উপাদানটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়?
● চক পাউডার ● সোপ
● স্যাকারিন ● গন্ধ দ্রব্য।
ঞ) বংশগতির ধারক ও বাহক নিচের কোনটি?
● প্লাস্টিড ● কোষ প্রাচীর
● মাইট্রোকন্ড্রিয়া ● ক্রোমোজোম।

৩। শুন্যস্থান পূরণ কর:-
ক) উদ্ভিদের ..... দিয়ে মাটি থেকে পানি ও খনিজ শোষণ করে।
খ) শব্দ ..... চলতে পারে না।
গ) সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ..... অণু পানি ব্যবহৃত হয়।
ঘ) ..... সকল শক্তির উৎস।
ঙ) সর্বমোট ..... খানা অস্থি নিয়ে মানব দেহ গঠিত।
চ) লোহিত রক্ত কণিকার আয়ূষ্কাল ..... দিন।
ছ) ই-মেইলে প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রে ..... ব্যবহার করা হয়।
জ) ইনসুলিন ..... গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়।
ঝ) মানুষের হৃদপিন্ড ..... প্রকোষ্ট বিভক্ত।
ঞ) সুষম খাদ্যে ..... খাদ্য উপাদান বিরাজমান থাকা উচিত।

৪। সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুন:-
ক) পূর্ণ বয়স্ক লোকের শরীরে ৩-৪ পিটার রক্ত থাকে।
খ) ঔঅগ এর আক্রমণে এইডস হয়।
গ) পেইন্টের উপাদান তিনটি।
ঘ) বস্তু বয়নের জন্যপ্রয়োজন হয়রং।
ঙ) পরমাণুর নিউক্লিয়াসই পরমাণুর শক্তির উৎস।
চ) মানুষের গলায় রয়েছে স্বরযন্ত্র।
ছ) ডিম্বাণু একটি জনন কোষ।
জ) উদ্ভিদ বায়ূমন্ডল থেকে গ্রহণ করে কার্বন ডাইঅক্সাইড।
ঝ) উৎস অনুযায়ী হে জাতীয় খাদ্যকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।
ঞ) স্পাইরুলিনা একটি ছত্রাক।

৫। বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করুন:-

ক) একটি বাস্তুসংস্থানে একাধিক	অ) রাইজয়েড
খ) পিতল তৈরি হয়	আ) সরীসৃপ
গ) সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে	ই) রক্তরস ও রক্ত কণিকা
ঘ) সোডিয়াম সালফেটের ব্যবহারিক নাম	ঈ) ফসফরাস
ঙ) মাটির রসে প্রচুর পরিমাণে	উ) গ্লোবার সল্ট
চ) আমাদের দেশে আদমশুমারী করা হয়	ঊ) বিকর্ষণ করে
ছ) অধাতব বহুরূপী মৌল	ঋ) খাদ্য-শৃংখল থাকতে পারে
জ) রক্তের উপাদানে থাকে	এ) তামা ও দস্তা দ্বারা
ঝ) টিকটিকি হলো	ঐ) খনিজলবণ থাকে
ঞ) মস উদ্ভিদে থাকে	ও) ১০ বছর পর পর।